

ISSN: 2249-4332

# OPEN EYES

**Indian Journal of Social Science, Literature,  
Commerce & Allied Areas**

Volume 19, No. 1, June 2022



**S R Lahiri Mahavidyalaya  
University of Kalyani  
West Bengal**

OPEN EYES

ISSN: 2249-4332

# OPEN EYES

**Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas**

Volume 19, No. 1, June 2022

‘Open Eyes’ is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the ‘information to the contributors’ given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Jt. Editor(s).

## **Advisory & Editorial Board**

**Professor (Dr.) Tapodhir Bhattacharya**

Eminent Author & Ex-Vice Chancellor, Assam University

**Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty**

Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India.

& Ex. Professor, Department of Folklore, University of Kalyani, West Bengal, India.

**Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay**

Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

**Professor (Dr.) Jadab Kumar Das**

Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

**Professor (Dr.) Samirranjan Adhikari**

Department of Education, Sidho-Kanho-Birsha University, Purulia, West Bengal

**Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman**

Department of English, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

**Dr. Biswajit Mohapatra**

Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

**Dr. Paramita Saha**

Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

**Dr. Prasad Serasinghe**

Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

## **Jt. Editor**

**Dr. Bhabesh Majumder**

(bhabesh70@rediffmail.com)

**Shubhaiyu Chakroborty**

(shubhaiyu007@gmail.com)

## Contents

অবতার থেকে অবতারাী : নির্বাচিত সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যচরিতে অবতারতত্ত্বের বিবর্তন	অভিজিত সাধুখাঁ	3
ব্রাত্যকবি ঈশ্বর গুপ্ত	শ্রীবাস বিশ্বাস	14
অভিজিৎ সেন-এর উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি	টুম্পা দাস	21
ছোটগল্পে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বয়ান	অভিষেক প্রামাণিক	31
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : নাটকে 'আত্মপরিচয়'	সুভাষ মণ্ডল	37
'গেরস্থর মেয়ে দিন-রাতির অমন কাগজে কলমে থাকলে, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়'— উনিশ শতকে বাংলার স্ত্রীশিক্ষায় 'অলক্ষ্মী'র নির্মাণ	শাশ্বতী রায়	43
Anton Chekhov's <i>The Duel</i> and the Missing Pistol Shot	Subhadip Das	52
Socio-economic Implications of Shakespearean Gravediggers in the Context of a Global Pandemic	Sayantani Ghosh	58
Cost Structure and Profitability of Major Crops Produced in West Bengal in the First Two Decades of the New Millennium : A review	Hemanta Sarkar	65
Beyond Cartography: The Unmappable in Anthony Minghella's Cinematic Representation of Michael Ondaatje's <i>The English Patient</i>	Dr. Chinnadevi Singadi Ms. Malvika Lobo	85

OPEN EYES



## অবতার থেকে অবতারী : নির্বাচিত সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যচরিতে অবতারতত্ত্বের বিবর্তন অভিজিত সাধুখাঁ

পুরাণ সাহিত্যের মাধ্যমে অবতার সম্পর্কে আমাদের পরিচয় গভীর হয়ে উঠলেও বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন অংশে অবতার ভাবনার পূর্বাভাস ছিল। ঋগ্বেদ-এর ৮.১৭.১৩ অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, ইন্দ্র ঋষি শৃঙ্গবৃষের পৌত্র। অনুমান করা যেতে পারে, এই সূক্ত ইন্দ্রের পার্থিব জগতে মানবীয় রূপের কল্পনাসূচক। দেবতারা যে মানুষের চেহারা পৃথিবীতে আসতে পারেন—অবতারতত্ত্বের মৌল ধারণার সূত্রপাত এখানেই। এছাড়া, বরাহ অবতারের সমুদ্রগর্ভ থেকে পৃথিবীকে তুলে আনার পূর্বসূত্র আছে শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪.১.২.১১) এ। শতপথ ব্রাহ্মণ (১২.৭.৩.১-৪) এর আরেকটি অংশে নৃসিংহাবতারের হিরণ্যকশিপু বধের পূর্বসূত্র আছে প্রতুষ্য মুহূর্তে জলের ফেনার সাহায্যে ইন্দ্রের নমুচি বধে। ইন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নমুচিকে তিনি দিনে বা রাতে, শুষ্ক অথবা আর্দ্র বস্তুর সাহায্যে, তালু অথবা মুষ্টির দ্বারা, যষ্টি অথবা ধনুকের মাধ্যমে হত্যা করবেন না! সেই কারণেই প্রতিশ্রুতির ফাঁকটুকু খুঁজে নমুচি বধের আয়োজন।<sup>১</sup>

অবতার শব্দের অর্থ নেমে আসা বা অবতরণ। সচরাচর, পাপভার হরণের জন্য পৃথিবীতে ঈশ্বরের মনুষ্যরূপে আবির্ভাবকেই বলা অবতার।<sup>২</sup> অবধারিতভাবে, আমাদের মনে পড়ে যাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা য় শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের উদ্দেশ্যে সেই অতি পরিচিত উক্তি—যুগে যুগে অধর্মের অভ্যুত্থানে সাধুজনের পরিব্রাজনের উদ্দেশ্যে, ‘ধর্মসংস্থাপন’—এর জন্য তিনি পৃথিবীতে আসেন। সমধর্মী উক্তি পাওয়া যাবে মহাভারত এর বনপর্ব এবং আশ্বমেধিক পর্বের—অসতের নিগ্রহ এবং ধর্মসংরক্ষণের জন্যই ঈশ্বর অবতীর্ণ হন মানুষের মাঝে।<sup>৩</sup> পাশাপাশি আরেকটা শব্দ অবতারতত্ত্বের অনিবার্য অংশ—অবতারী। ‘অবতারী’র অর্থ অবতারণকারক, যাঁর দেহে সর্ব অবতারের স্থিতি, যিনি অবতারগণের আশ্রয়।<sup>৪</sup> অর্থাৎ, বৈষ্ণব অবতারতত্ত্বের প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী, বিষ্ণু বা নারায়ণই সর্বোচ্চ দেবতা; তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতির মূল, নীতিব্যবস্থার পরিচালক। অধর্মের অভ্যুত্থানে এই ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে তিনি অবতারী হিসাবে পৃথিবীতে অবতারের আবির্ভাব ঘটান।<sup>৫</sup> বিষ্ণুর অবতার হিসাবেই ব্রাহ্মণ্য পুরাকথায় মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি অবতারের কল্পনা। জনপ্রিয় বিশ্বাস অনুযায়ী অবতার দৈত্যারি—দৈত্য দমনই তাঁর কাজ। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অবতারতত্ত্ব বইতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শংকরাচার্যের গীতাভাষ্যের সূত্রে বলেন, ভগবানের নিজের কোন প্রয়োজন নেই; জীবের প্রতি অনুগ্রহ করেই তিনি অবতারত্ব স্বীকার করেন।<sup>৬</sup>

অবতারতত্ত্বের ক্ষেত্রে অবতারী ও অবতারের সম্পর্ক বিষয়ে রয়েছে চারটি আলাদা তত্ত্বভাবনা। প্রথম তত্ত্ব অনুযায়ী, বিষ্ণুর অদ্ভা দিব্য শরীর ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এসে নরদেহ ধারণ করে। এই মত অনুযায়ী বিষ্ণুর আত্মার কোন অংশই অবতারগ্রহণ কালে তাঁর দিব্য শরীরে থাকে না। দ্বিতীয় তত্ত্ব বলছে, বিষ্ণুর অখিল আত্মার একটি অংশ তাঁর অবতারের অংশ হিসাবে অবতীর্ণ হলেও বাকি অংশ রয়ে যায় তাঁর দিব্য শরীরে। তৃতীয় তত্ত্বের বক্তব্য, বিষ্ণু নিজেকে ভাগ করে নিয়েছেন দুটি মূর্তিতে—একটি মূর্তি স্বর্গে নানা কৃষ্ণসাধনে ব্যস্ত; দ্বিতীয় মূর্তি অনস্তশয়নে নিমগ্ন। এই দ্বিতীয় মূর্তিই সহস্র বছর নিদ্রামগ্ন থাকার পর বিশেষ পরিস্থিতিতে অবতার হিসাবে নেমে আসেন পৃথিবীতে। এই ভাবনা অনুযায়ী, অবতার বিষ্ণুর এই দ্বিতীয় মূর্তি বা দেহের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। চতুর্থ তত্ত্ব চতুর্ভুহ সাধনাকেন্দ্রিক। নিষ্ঠুর্ণ বিষ্ণু মায়াপ্রভাবে পার্থিব রূপ ধারণ করে এক দেহ থেকে চার দেহের সৃষ্টি করেন। এই চতুর্দেহের মধ্যে তৃতীয় অর্থাৎ সাত্ত্বিক প্রদুম্বের দায়িত্ব ধর্মসংস্থাপন, প্রয়োজনমায়িক অবতার হিসাবে সাধুজনের রক্ষা

সাধুখাঁ, অভিজিত : অবতার থেকে অবতারী : নির্বাচিত সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যচরিতে অবতারতত্ত্বের বিবর্তন

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 1, June 2022, Page : 3-13, ISSN 2249-4332

এবং অধর্মাচারী দমন। এই মত অনুযায়ী, অবতার বিষ্ণুর তৃতীয় দেহের প্রতিনিধি; কার্যত অবতারীর ২৫ শতাংশ।<sup>১</sup>

অবতারতত্ত্বের ধারণা শৈব বা শাক্তধর্মে থাকলেও বৈষ্ণবধর্মেই অবতার কল্পনার প্রভাব বেশি। কেউ কেউ তো এমনও বলেছেন— শৈবধর্মে অবতার সংক্রান্ত ভাবনা থাকলেও, তার গুরুত্ব তুলনায় কম। শিবের অবতার সংক্রান্ত কাহিনিগুলি বাদ দিলেও শিব সংক্রান্ত পুরাকথার এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার পড়ে থাকে; আর বিষ্ণুকেন্দ্রিক পুরাকথা থেকে অবতার সংক্রান্ত কাহিনিগুলি সরিয়ে নিলে পুরাকথার ভাণ্ডারটিই দরিদ্র হয়ে যায়!<sup>২</sup> চৈতন্য অনুসারী বঙ্গদেশের বৈষ্ণব এবং বৃন্দাবনী আদর্শে চালিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও অবতার সম্পর্কিত ধারণাটিকে তাঁদের তত্ত্বভাবনায় গ্রহণ করেছেন সমাদরে। একাধিক সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যচরিতে সেই ভাবনার প্রকাশ আছে। খ্রিস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত ও বাংলা চৈতন্যচরিতগুলি পর্যালোচনা করলে অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে ভাবনার একটা বিবর্তন চোখে পড়ে। বৃন্দাবনের গোস্বামীমত প্রতিষ্ঠার পূর্বে রচিত চরিতগ্রন্থগুলি চৈতন্যদেবকে ঠিক যে অর্থে অবতার হিসাবে দেখেছে, সেই ভাবনার সম্মতি পাওয়া যাবে না ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় রচিত বৃন্দাবনের গোস্বামীমতে নিষ্ণগত কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* এ। চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণায় তাহলে কীভাবে বদল আসছে? অবতার আর অবতারীর সম্পর্ক প্রসঙ্গেই বা চরিতগ্রন্থগুলির অবস্থানগত বদল ঘটছে কীভাবে?— এই প্রশ্নগুলিই আমাদের আলোচ্য।

তবে সেই আলোচনায় ঢোকার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক প্রাক্ চৈতন্যযুগের বঙ্গদেশে রচিত বিভিন্ন সাহিত্যে অবতার সম্পর্কে কী ধারণা প্রচলিত ছিল? বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* এর জন্মখণ্ডে কংসের দৌরাত্ম্য নিবারণে নারায়ণের কৃষ্ণ হিসাবে পৃথিবীতে অবতরণের কথা আছে। এই আখ্যানের বয়ান অনুযায়ী ব্রহ্মাসহ বিভিন্ন দেবতার কংসবধের আবেদন নিয়ে গেলেন সমুদ্রে অনন্তশয্যায় অধিষ্ঠিত নারায়ণের কাছে। তিনি সাদা আর কালো রঙের দুটি কেশ তুলে দিলেন আগত দেবতাদের হাতে—এই থেকেই জন্ম নেবেন কৃষ্ণ আর বলরাম।<sup>৩</sup> অবতারতত্ত্বের প্রথাগত ধারণা অনুযায়ী *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* বলছে, ভারহরণের জন্যই কৃষ্ণের জন্ম। পাশাপাশি খেয়াল রাখা দরকার, অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে যে চারটি তত্ত্বের কথা ইতিপূর্বেই আমরা বলেছি, তার তৃতীয় তত্ত্বের সঙ্গে এই বয়ানের কিছুটা সামঞ্জস্য আছে— অর্থাৎ, বিষ্ণু বা নারায়ণের দ্বিবিধ মূর্তির মধ্যে ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয়নে মূর্তি থেকেই অবতারের আবির্ভাব। প্রায় একইরকম বক্তব্য পাওয়া যাবে *কৃতিবাসী রামায়ণ* এও—

ক্ষীরোদ সাগরে বিষ্ণু আছেন শয়নে।

স্তুতি কর গিয়া তোমরা বিষ্ণুর চরণে।।

চারিদিকে স্তুতি করে সকল দেবগণ।

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোসত্রিঃ জলেতে শয়ন।।<sup>৪</sup>

অনন্তশয্যায় শয়নরত বিষ্ণু এক্ষেত্রে রাবণবধের জন্য দশরথের গৃহে রাম-অবতার হিসাবে জন্ম নেবেন। উপরিউক্ত দুটি ক্ষেত্রেই বিষ্ণুই সর্বোচ্চ দেবতা হিসাবে স্বীকৃত, তিনিই অবতারী। কৃষ্ণ, বলরাম এবং রাম অবতার। অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে একটু ভিন্ন বয়ান পাওয়া যাবে তর্কযোগ্যভাবে প্রাক্ চৈতন্যযুগের রচনা রামাই পণ্ডিতের *শূন্যপুরাণ* এর ‘শ্রীনিরঞ্জনের রুদ্গা’ অংশে। এই আখ্যানের অবতার কল্পনায় দেখা যাচ্ছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মান্বলম্বীদের বাড়াবাড়ন্ত এবং সদ্ধর্মী অর্থাৎ বৌদ্ধদের প্রতি তাঁদের নিপীড়ন দেখে দেবতার মুসলমানের বেশে অবতীর্ণ হলেন এবং দেউল ভেঙে শায়েস্তা করলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মান্বলম্বীদের। ধর্মঠাকুর যবন, ব্রহ্মা মহামদ অর্থাৎ মহম্মদ, বিষ্ণু পেকাম্বর অর্থাৎ পয়গম্বর, গণেশ গাজী হিসাবে অবতীর্ণ হলেন পৃথিবীতে।<sup>৫</sup> সামান্য ভিন্নতা সত্ত্বেও লক্ষণীয়, দেবতাদের যবন, পয়গম্বর বা গাজীরূপে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গেও দুষ্টদমনের ধারণা জড়িত। এক্ষেত্রেও অবতার ‘দৈত্যারি’।

অবতার সংক্রান্ত এই ধারণার প্রতিফলন আছে একাধিক চৈতন্যচরিতেও। *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত* বা মুরারি

গুপ্তের কড়চা লিখিত হয়েছিল চৈতন্যদেবের তিরোধানের বছর দুয়েকের মধ্যে। অনুমান করা চলে, ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থরচনা শেষ হয়।<sup>১৯</sup> মুরারি গুপ্তের রচনার প্রথম প্রক্রমের চতুর্থ সর্গের মতে, অবতার দু'রকম—যুগাবতার আর কার্যাবতার। যুগাবতাররা যুগে যুগে পৃথিবীতে যুগধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। সত্যযুগে শুক্ল, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পৃথু আর কলিতে শ্রীচৈতন্যই যুগাবতার।<sup>২০</sup> মুরারি গুপ্তের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব হরির অংশ—

‘লেভে গর্ভং হরেরংশং গঞ্জব শান্তবং শুভা।’<sup>২১</sup>

মুরারি গুপ্ত যে চৈতন্যদেবকে বিষ্ণুর অংশ হিসাবে দেখতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন, তার প্রমাণ আছে ১.১.১৪ শ্লোকেও। চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী, শ্রীবৎস চিহ্ন শোভিত বিষ্ণুকেই তিনি শ্রীচৈতন্য হিসাবে দেখেছেন।<sup>২২</sup> বিষ্ণুকে অবতারী হিসাবে দেখার যে প্রবণতা আমরা প্রাক্ চৈতন্যযুগের রচনাতে দেখেছি, সেই ধারণার ছাপ আছে মুরারি গুপ্তের কড়চাতেও। পাশাপাশি, পরবর্তীকালে বৃন্দাবনের গোস্বামীমতে চৈতন্যদেবকে ‘স্বয়ং ভগবান’ হিসাবে দেখার যে প্রবণতা তৈরি হল, তারও পূর্বাভাস রয়ে গেল এই রচনায়। ১.১২.১৮-১.১২.১৯ এবং ১.১৫.১ ইত্যাদি শ্লোকে চৈতন্যদেবকে মুরারি গুপ্ত ‘স্বয়ং ভগবান’ বা ‘শ্রীহরি’ বলেই বর্ণনা করেছেন।

বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, কবি কর্ণপুরের *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়* নাটক রচিত হয়েছিল চৈতন্যদেবের তিরোধানের বছর দুয়েকের মধ্যে (অর্থাৎ ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ); আর *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য* এর রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দ।<sup>২৩</sup> *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়* নাটক এ চৈতন্যদেবকে বলা হয়েছে ‘স্বয়ং ভগবান’—‘শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয়েন স্বয়ং ভগবান।’<sup>২৪</sup> ঈশ্বররূপ কৃষ্ণ চৈতন্য কৃষ্ণ উপাসনা ও নামসংকীর্তন প্রচারের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হলেন।<sup>২৫</sup> কবি কর্ণপুরের নাটকে চৈতন্যদেবের ভগবত্তা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মুরারি গুপ্তের থেকে কিছুটা আলাদা এবং অনেক বেশি বৃন্দাবনী মতের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। তবে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে বৃন্দাবনী ধারা এবং বিশেষত কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* এর যে সিদ্ধান্ত, যে সম্পর্কে আমরা পরে বিশদে আলোচনা করব, তার থেকে কবি কর্ণপুরের ভাবনা একটু পৃথক। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে রচিত *শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য* এ ১.৮ নং শ্লোকে যদিও কবি কর্ণপুর চৈতন্যদেবকে ‘ব্রজবরবধুগণের প্রাণনাথ’ বলে কৃষ্ণের সঙ্গে সমীকৃত করেছেন<sup>২৬</sup>, কিন্তু তাঁর মতে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ‘ত্রিবিধ তাপতপনে’ ক্লিষ্ট জীবের উদ্ধারের জন্য।<sup>২৭</sup> অর্থাৎ, কবি কর্ণপুরের বয়ান অনুযায়ী কৃষ্ণ উপাসনা, নামসংকীর্তন ইত্যাদির প্রচার এবং জীব উদ্ধারই চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ।

১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত বৃন্দাবন দাসের *শ্রীচৈতন্যভাগবত* বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ চৈতন্যচরিত গ্রন্থ। বৃন্দাবন দাস তাঁর গ্রন্থের আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্য অবতারের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে *শ্রীমদভগবদ্গীতা* র শ্লোকের কার্যত বঙ্গানুবাদ করেছেন,

ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে।  
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।।  
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।  
ব্রহ্মাদি প্রভুর পায়ের করে বিজ্ঞাপনে।।  
তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।  
সাম্প্রোপাঙ্গে অবতীর্ণ হয়ে পৃথিবীতে।।<sup>২৮</sup>

ব্রহ্মাসহ অন্যান্য দেবতাদের প্রভু অর্থাৎ বিষ্ণুর কাছে প্রণত হয়ে পৃথিবীর সমস্যা নিবেদনের ব্যতীত নিঃসন্দেহে যুগধর্ম স্থাপন প্রসঙ্গে অবতারতত্ত্বের প্রথাগত ধারণাটি খেয়াল করিয়ে দিচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুকরণে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা বর্ণনা করলেও এই বয়ানে দেখা যাচ্ছে অবতারী অবতার সম্পর্ক। শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন দাসের দৃষ্টিতে ‘স্বয়ং ভগবান নন’; বরং বিষ্ণু বা কৃষ্ণের অবতার। কলিতে যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন। নাম সংকীর্তন প্রচারের উদ্দেশ্যেই শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হয়েছেন। পাশাপাশি খেয়াল রাখা দরকার, নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত বৃন্দাবন

## OPEN EYES

দাস আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বন্দনাক্লোকে ‘যুগধর্মপালৌ’, ‘করণাবতারৌ’ ইত্যাদি দ্বিবচনজ্ঞাপক শব্দের মধ্য দিয়ে কার্যত সমগুরুত্ব দিয়েছেন শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দকে।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের রচনা।<sup>১৯</sup> জয়ানন্দ গদাধর গোস্বামীর শিষ্য এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের কৃপাধন্য হলেও তাঁর বইয়ের কদর বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ ছিল না। বৃন্দাবনের গোস্বামীমতের ছাপ তাঁর চৈতন্যচরিত্র ব্যাখ্যায় কম। চৈতন্যমঙ্গল শুনলে তীর্থযাত্রা, অশ্বদান, কন্যাদান ইত্যাদির ফল মেলে—জয়ানন্দের এছেন বক্তব্যও গোস্বামীমতের বিরোধী।<sup>২০</sup> অবতারতত্ত্ব সম্পর্কেও জয়ানন্দের ধারণা গোস্বামীমতের থেকে আলাদা। ক্ষীরোদসাগরে অনন্তশয্যায় আসীন নারায়ণের কাছে পাপভারতুর পৃথিবীর দুঃখ নিবেদনের জন্য ব্রহ্মাসহ দেবতাদের আগমন বৃত্তান্তে প্রচলিত বয়ানকেই অনুসরণ করেছেন জয়ানন্দ। শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণু বা নারায়ণের কল্পনাই এখানে মুখ্য। কলিযুগের নানাবিধ অনাচারে ‘রসাতল’গামী পৃথিবীকে উদ্ধারের সংকল্প নিয়ে নারায়ণ বা শ্রীহরি প্রতিশ্রুতি দিলেন দ্বিজকুলে জন্মে সন্ন্যাসীরূপে হরিসংকীর্তন প্রচারের। নারায়ণ বা বিষ্ণুর অবতার হিসাবেই এখানে শ্রীচৈতন্যের অবতারণা; অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মস্থাপন। কতকটা মুরারি গুপ্তের অনুসরণেই জয়ানন্দের কাছেও চৈতন্যদেব যুগাবতার—

“ঈশ্বরের লীলা সে বুঝিতে শক্তি কার/ধর্মস্থাপন হেতু যুগ অবতার।”<sup>২১</sup>

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল-এর রচনাকাল ১৫৬০-১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে।<sup>২২</sup> চৈতন্যাবতারের বর্ণনায় পূর্বসূরী মুরারি গুপ্ত বা জয়ানন্দের সঙ্গে লোচনের তফাত আছে। লোচনদাস কৃষ্ণ বা চৈতন্যদেবকে যুগাবতার বলে স্বীকার করতে চাননি—‘বৃন্দাবন চন্দ্র যুগ অবতার নহে’। ভাগবতবচন স্বীকার করে তিনি বলেছেন—‘কৃষ্ণভগবান স্বয়ম্’। অন্যান্য যুগে অংশাবতার বা ইত্যাদি অবতীর্ণ হলেও ছাপরে আর কলিতে পূর্ণ অবতার বা স্বয়ং ভগবানই অবতীর্ণ হন।<sup>২৩</sup> লোচনদাসের চরিতগ্রন্থ অনুযায়ী কলিযুগে অবতীর্ণ চৈতন্যদেবের লক্ষ্য—

‘গুণ সঙ্কীর্ণন নাম প্রকাশ করিব।

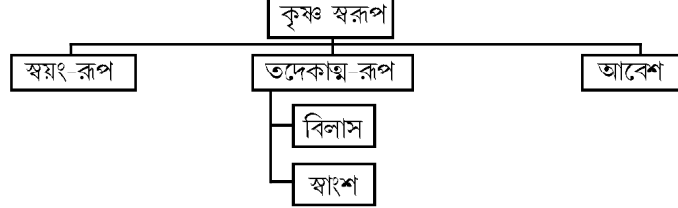
নিজ ভক্তি প্রেমরস সুখে প্রচারিব।’<sup>২৪</sup>

লোচনের রচনায় কৃষ্ণ চৈতন্যের অভিন্নত্ব এবং ‘স্বয়ং ভগবান’ হিসাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পরবর্তীকালের বৃন্দাবনী ভাবনাতেও দেখা যাবে। এই বক্তব্যের সূত্রপাত অবশ্য আমরা দেখেছি কবি কর্ণপুরের রচনায়।

বঙ্গদেশের চৈতন্য অনুসারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের রচিত চরিতগ্রন্থে চৈতন্য অবতারত্বের প্রসঙ্গ আমরা লক্ষ করলাম। এবারে, দেখা দরকার এই তত্ত্বভাবনার সঙ্গে বৃন্দাবনীমতের সম্পর্ক কীরকম? এই পর্যায়ে আমাদের আলোচনা মুখ্যত কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (রচনাকাল ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের পরে) কেন্দ্রিক। ইতিপূর্বে দু’একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে আমরা দেখেছি চৈতন্যচরিত রচয়িতারা চৈতন্যদেবকে অবতার এবং বিষ্ণু বা নারায়ণ বা কৃষ্ণকে অবতারী হিসাবে দেখেছেন। প্রায় প্রতিটি চরিতগ্রন্থই মনে করেছে, যুগধর্ম প্রতিষ্ঠা, নাম সংকীর্তনের প্রসার, জীব উদ্ধারই চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ। এখন আমরা দেখব, অবতার অবতারী সম্পর্ক এবং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এর বিশ্লেষণ ঠিক কী?

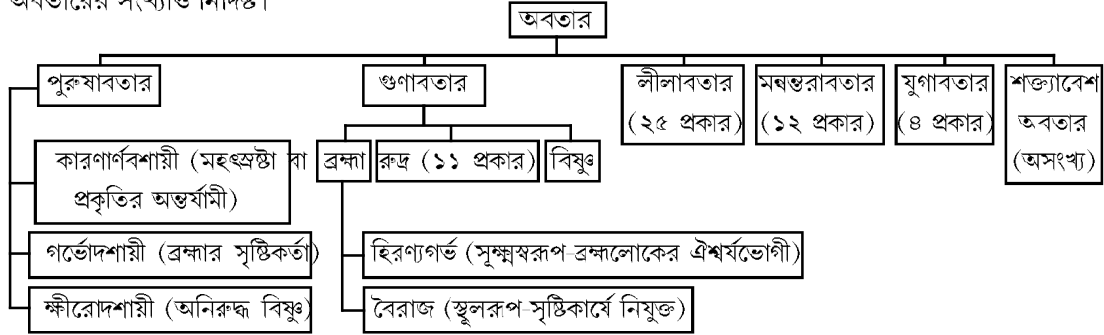
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-এর আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই বিশ্লেষণ অবশ্য বৃন্দাবনের গোস্বামীসিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবতারতত্ত্ব সম্পর্কে সনাতন গোস্বামী বিশদে আলোচনা করেছেন বৃহদভাগবতামৃত বইতে। সেই বইয়ের আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত এবং প্রণালীবদ্ধ আকারে লঘুভাগবতামৃত-এ পেশ করেছেন রূপ গোস্বামী। ভাগবতপুরাণ গোস্বামীসিদ্ধান্তের অন্যতম ভিত্তি হলেও তাঁরা নিজেদের দার্শনিক বিবেচনার সঙ্গে সামুজ্য রেখে প্রাচীন তত্ত্বভাবনার কিছুটা বদলও ঘটিয়েছেন। কৃষ্ণস্বরূপের তিনটি দিক—(ক) স্বয়ং রূপ—যা স্বতঃসিদ্ধ এবং অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়; ‘অনন্যাপেক্ষী’; (খ) তদেকাগ্ন রূপ—এমন এক কায়িক অভিব্যক্তি যা স্বয়ং রূপের সঙ্গে সারতত্ত্বগত এবং সত্ত্বাগতভাবে এক হলেও

আকৃতিগতভাবে আলাদা। তদেকাক্স রূপের দুটি ভাগ—এক। বিলাস; যা স্বয়ং রূপের সমশক্তিধর, যেমন—নারায়ণ; দুই। স্বাংশ : যা স্বয়ং রূপের থেকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিধর, যেমন—সংকর্ষণ অথবা মৎস্য; (গ) আবেশ—শক্তি, জ্ঞান বা ভক্তির দ্বারা মহৎ ব্যক্তিকে আবিষ্ট করে যখন স্বয়ং রূপের প্রকাশ হয়, যেমন—শক্তি আবেশ রূপে শেষ, জ্ঞান আবেশ রূপে সনক, ভক্তি আবেশ রূপে নারদ।



এই শ্রেণিবিভাগে 'স্বয়ং ভগবান' এর তৎ স্বরূপে আবির্ভাব বা 'প্রকাশ'কে ধরা হয়নি। এহেন প্রকাশের নমুনা দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ। সাধারণভাবে স্বাংশ এবং আবেশরূপগুলিকেই আমরা অবতার হিসাবে চিনি। 'স্বয়ং ভগবান' কৃষ্ণ একবারই দ্বাপরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।<sup>২৭</sup>

গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে অবতারা কৃষ্ণের অবতারদের মূলত ৬ ভাগে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রকার অবতারের সংখ্যাও নির্দিষ্ট।<sup>২৮</sup>



এই শ্রেণিবিভাগ খেয়াল করলে প্রথমেই অবতারতত্ত্বের চিরাচরিত ভাবনা একটু খাঁকা খায়। বিষ্ণুকে অবতারা আর কৃষ্ণকে অবতার হিসাবে দেখার যে প্রচলিত ভাবনা, তা এখানে উলটে গেছে। কৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে অবতারা; 'স্বয়ং ভগবান'। সেই 'স্বয়ং ভগবান' এর প্রকটলীলাই দেখা গেছে দ্বাপরে। বিষ্ণু ইত্যাদি পুরুষাবতার, গুণাবতার হিসাবে স্বীকৃত। ভারহরণকেও 'স্বয়ং ভগবান' হিসাবে আবির্ভূত কৃষ্ণের কাজ হিসাবে দেখতে চায়নি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা র মতো রচনায় কৃষ্ণ যতই স্বমুখে সাধুজনের পরিত্রাণ, দুষ্টিজনের বিনাশকে তাঁর উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করুন না কেন; বৃন্দাবনের গোস্বামীসিদ্ধান্ত কৃষ্ণের সেই 'দৈত্যারি' ভাবমূর্তিরও নতুন ব্যাখ্যা পেশ করেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা র দৃষ্টিতে কৃষ্ণ অবতার হলেও বৃন্দাবনের গোস্বামীমতে তিনি 'স্বয়ং ভগবান'। এই অবস্থানগত পার্থক্যের কারণেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছে,

পূর্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে,  
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে!  
স্বয়ং ভগবানের কর্ম নহে ভারহরণ;  
স্থিতিকর্তা বিষ্ণু করে জগৎপালন।<sup>২৯</sup>

যে 'ভারহরণ' এযাবৎ অবতার গ্রহণের মূল কারণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাকে 'স্বয়ং ভগবান' এর কাজ বলেই মনে করলেন না। দুষ্টির দমনস্বরূপ 'অসুরমারণ'কে বললেন 'আনুসঙ্গ কর্ম'!<sup>৩০</sup> কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে, স্বয়ং ভগবান

## OPEN EYES

শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলে তাঁর শরীরের অংশ হিসাবে অবতীর্ণ হন বিষ্ণুসহ অন্যান্য অবতাররাও। সেই বিষ্ণুই আসলে ‘অসুরমারণ’ করে থাকেন; তবে প্রতীতি জন্মায় একাজ শ্রীকৃষ্ণেরই। একইসঙ্গে, কবি কর্ণপুরের মতো কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে যেভাবে দেখা হয়েছে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পূর্ববর্তী চরিতগুলিতে, সেই দৃষ্টিকেও বদলে দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। কীভাবে? শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এর এক টীকাকার লিখেছেন—শাস্ত্রমতে ‘স্বয়ং ভগবান’ কৃষ্ণ ছাড়া তাঁর কোন অবতার প্রেম দিতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঐশীর্ষ্যে লতাগুন্মকেও আবিষ্ট করতে পারেন প্রেমে। সেই একই গুণের প্রকাশ দেখা যায় শ্রীচৈতন্যদেবে। তিনিও সকলকে প্রেম দিয়েছেন; অতএব শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অভিন্ন।<sup>১০</sup> টীকাকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বরূপও নিত্য এবং অনাদি। এই কলিযুগে নবদ্বীপে তাঁকে দেখা গেছে প্রকটলীলায়। শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে কার্যত অভেদ; শুধু ব্রজের শ্রীকৃষ্ণে রাধার অঙ্গকান্তি আর মাদনাখ্য মহাভাব নেই। এই দুইয়েরই প্রকাশ আছে নবদ্বীপে প্রকট ‘রাধাভাবদ্যুতি’যুক্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে।<sup>১১</sup> মনে রাখা যেতে পারে, রাধা কৃষ্ণের যুগলমূর্তি হিসাবে চৈতন্যদেবকে দেখার এই কল্পনা অর্থাৎ একই দেহে নারী পুরুষের সহাবস্থান ভারতীয় পুরাকথার জগতে পরিচিত। শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিই তার প্রমাণ।<sup>১২</sup> ইতিপূর্বে রচিত বিভিন্ন চরিতে চৈতন্যদেবকে অবতার হিসাবে দেখা হলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদের বন্দনাক্ষোকে কৃষ্ণচৈতন্যকেই ঈশ্বর এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য শ্রেষ্ঠ পরতত্ত্ব হিসাবে উপস্থাপন করেছেন—

‘যুগধর্ম প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে;

আমা বিনে অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।’<sup>১৩</sup>

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এর টীকাকার জানিয়েছেন, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ণ ভগবান; যুগধর্ম প্রবর্তন তাঁর কাজ নয়। যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্য ‘স্বয়ং ভগবান’ এর অংশ যুগাবতারই যথেষ্ট। ‘স্বয়ং ভগবান’ এর অবতরণের সময়ে যেহেতু অন্যান্য অবতাররাও তাঁর সঙ্গে মিলিত হন; তখন ‘স্বয়ং ভগবান’ এর প্রেরণাতে যুগাবতারই কলিতে নামসংকীর্তন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু, যুগাবতারের পক্ষে ব্রজপ্রেম দান করা অসম্ভব। সেই উদ্দেশ্যেই ‘স্বয়ং ভগবান’ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাব।<sup>১৪</sup> এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ব্রজপ্রেম তো শ্রীকৃষ্ণ ছাপরে দিয়েছেন; পুনরায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আবির্ভাবের কী প্রয়োজন? এক টীকাকার উত্তরে জানাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমদান আর শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমদানে ফারাক আছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমদান করেছেন কেবল ভক্তদের, আর চৈতন্যদেবের প্রেমে পাত্রাপাত্র বিচার নেই।<sup>১৫</sup> আদিলীলার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। পঞ্চম শ্লোকে বলা হচ্ছে, রাধা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপা হুাদিনীশক্তি। স্বরূপত শক্তি আর শক্তিমানের অভেদবশত তাঁরা একাঙ্গা। তবুও একাঙ্গা হয়েও গোলকে তাঁরা আছে পৃথক দেহে। কলিতে তাঁরা দু’জনে একই দেহে শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে আবির্ভূত। ষষ্ঠ শ্লোকে, শ্রীচৈতন্যের দেহে রাধা কৃষ্ণের যুগলমূর্তিতে প্রকাশের কারণ হিসাবে বলা হল—

শ্রীরাধার প্রেমের মাহাত্ম্য কীরকম? সেই প্রেমে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য আশ্বাদন করেন, তার প্রকৃতি কীরকম? মাধুর্য অশ্বাদনে শ্রীরাধার যে সুখ, সেই সুখই বা কেমন?—এই প্রশ্নের উত্তর পেতেই রাধার অঙ্গকান্তিসহ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যদেব হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোককেই বলা হচ্ছে, চৈতন্য আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ বা মূল

কারণ বিশ্লেষক শ্লোক। এই তত্ত্বাবনার সাহায্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীধারা চৈতন্যদেব সম্পর্কিত পূর্ববর্তী অবতারভাবনার সঙ্গে নিজেদের দার্শনিক অবস্থানগত পার্থক্য দেখিয়ে দিলেন স্পষ্টভাবে। অবতার হিসাবে সংস্কৃত ও বাংলা চরিত্তগুলিতে চৈতন্যদেবের যে যাত্রা চলছিল, তা পরিণত হল চৈতন্যদেবের ‘অবতারী’ হিসাবে প্রতিষ্ঠায়। চৈতন্যদেবকে অবতার হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রক্রিয়াও দার্শনিক মহলে নিঃসংশয় সমর্থন পায়নি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এ তার দু’একটি নমুনাও আছে। সেই তর্কের মুখোমুখি হয়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বরণ অবতার নয়; অবতারী হিসাবেই প্রতিষ্ঠা করেছে চৈতন্যদেবকে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য গোপীনাথ আচার্যকে বলেছিলেন— শাস্ত্রমতে, অবতার ‘ত্রিযুগ’ নামে প্রসিদ্ধ; অতএব কলিতে বিষ্ণুর অবতার হয় না। সুতরাং চৈতন্যদেব মহাভাগবত হলেও, ‘অবতার’ নয়। গোপীনাথ আচার্য পাল্টা বলেছিলেন—

“শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে।  
ভাগবত, ভারত— দুই শাস্ত্রের প্রধান,  
সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান।  
সেই দুই কহে কলিতে ‘সাক্ষাৎ অবতার’,”<sup>১৬</sup>

অর্থাৎ, শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ আর মহাভারত অনুসারে, কলিতে অবতার নয়; বরণ অবতারী ‘স্বয়ং ভগবান’ এর আবির্ভাব ঘটে। কলিযুগে লীলাবতার নেই বলে অবতার ‘ত্রিযুগ’ নামে পরিচিত ঠিকই; কিন্তু এতে অবতারীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা নাকচ হয় না।<sup>১৭</sup>

প্রশ্ন হচ্ছে, বৃন্দাবনী ধারায় কৃষ্ণকে ‘অবতার’ হিসাবে না দেখে ‘অবতারী’ বা ‘স্বয়ং ভগবান’ বলে মনে করার পূর্বসূত্র কী? এ প্রশ্নে, স্বয়ং চৈতন্যদেবের অতি প্রিয় দুটি রচনার উল্লেখ করা যেতে পারে— শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ আর জয়দেবের শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্। পুরাণসাহিত্যে বিষ্ণু কৃষ্ণের কিছু অবস্থানগত বদল চোখে পড়ে। হরিবংশ এ বিষ্ণু ও কৃষ্ণ দুজনেই উপস্থিত এবং দুজনেই আছেন নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার কেন্দ্রে; তবুও কৃষ্ণকেন্দ্রিক কাহিনিগুলি যেন অনেকটাই বিষ্ণুনির্ভর। কৃষ্ণ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন বিষ্ণুর ‘অংশ’ হিসাবে; সেই সূত্রেই এই নির্ভরতার জন্ম। বিষ্ণুপুরাণ এ বিষ্ণু আর ব্রহ্ম সমীকৃত। ৪.১১.৪, ৫.১৩.২২ ইত্যাদি শ্লোকে কৃষ্ণকে কয়েকবার ‘ব্রহ্ম’ বলা হলেও, কৃষ্ণ এই মর্যাদা পেয়েছেন বিষ্ণুর সঙ্গে তিনি অভিন্নরূপে গণ্য বলেই। খেয়াল রাখা দরকার, ‘পরমাত্মা’ নামক বিশেষণ কৃষ্ণের তুলনায় বিষ্ণুর প্রতিই এই পুরাণে বেশি প্রযুক্ত। কৃষ্ণ এখানে বিবেচিত হয়েছেন বিষ্ণুর ‘অংশাংশ’ হিসাবে। ভাগবত এ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান শব্দগুলি মূলত কৃষ্ণের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত। সর্বোচ্চ অস্তিত্ব বোঝাতে ব্যবহৃত ‘ভগবান’ শব্দটির বিষ্ণুর তুলনায় বেশি দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে। এমনকি, ১.৩.২৮ শ্লোকে ভাগবত বলে, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান—কৃষ্ণস্ত ভগবান স্বয়ম্।<sup>১৮</sup> অবতার থেকে কৃষ্ণ যে আন্তে আন্তে পুরাণসাহিত্যে অবতারী হয়ে উঠেছিলেন, সেই পালাবদলের রেশ আছে ভাগবত এও। এই পুরাণের দুটি অবতার তালিকায় (১.৩.৬-২৫ এবং ১১.৪.১৭-২২) কৃষ্ণকে একাধিক অবতারের অন্যতম বলা হলেও, এই অবতার তালিকার শেষেই পাঠক বা শ্রোতাকে খেয়াল করিয়ে দেওয়া হয়েছে, বৃহত্তম প্রেক্ষিতে কৃষ্ণ নিছক একাধিক অবতারের একজন নয়; তিনিই ‘স্বয়ং ভগবান’। তিনিই সৃষ্টির প্রারম্ভে বিশ্বপুরুষ মূর্তি ধারণ করেছিলেন। তিনিই সমস্ত অবতারের অবতারী।<sup>১৯</sup> ভাগবত এর এই উত্তরাধিকার দেখা যাবে গীতগোবিন্দ এও। জয়দেবের কাব্যের প্রথম সর্গে দশাবতার বন্দনায় অবতার তালিকায় কৃষ্ণ অনুপস্থিত। দশাবতার বন্দনার শেষে অবশ্য জয়দেব দশবিধরূপধারী কৃষ্ণকেই অবতারী হিসাবে বন্দনা করেছেন—

“শ্ৰু সুখদং শুভদং ভবসারম্।  
কেশব, ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে।”<sup>২০</sup>

ভাগবত আর গীতগোবিন্দ এর এই উত্তরাধিকার রয়েছে বৃন্দাবনের গোস্বামীমতে। সেই সূত্রেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

## OPEN EYES

শ্রীকৃষ্ণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে দেখেছে ‘ঈশ্বর ভগবান’ বা ‘অবতারী’ রূপে। যিনি ছাপরে প্রকট হয়েছেন ব্রজধামে, তাঁরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকটলীলা কলিয়ুগে নবদ্বীপে। তবে, ভাগবত এর সঙ্গে একটা দার্শনিক পার্থক্যও বজায় রেখেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও ধর্মসাহিত্য। ভাগবত এ কৃষ্ণের অবতরণ ভারহরণের জন্যই—‘ভারাবতারণায়ান্যে ভুবো নাব ইবাদ্যৌ’। সেকারণেই ভাগবত এ অসুরনিধনে কৃষ্ণের বীরত্বের পুনঃপুনঃ প্রকাশ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন বীর কৃষ্ণের বদলে প্রেমিক কৃষ্ণকেই গুরুত্ব দিয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দর্শনগ্রন্থ আর সাহিত্যে তাই রাখাপ্রেমের মাধুর্য আত্মদানই চৈতন্য আবির্ভাবের অন্তরঙ্গ কারণ হিসাবে স্বীকৃত।<sup>১০</sup>

চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে অবস্থান আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে দেখলাম, তার ছাপ সমসাময়িক এবং ঈশ্বর পরবর্তীকালে রচিত মধ্যযুগের অন্যান্য বাংলা সাহিত্যে আছে কি? কয়েকটি নমুনা এ প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে। মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল এর রচনাকাল ১৫৯৫-১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে।<sup>১১</sup> এই রচনার চৈতন্যবন্দনা অংশে দেখছি, ‘কৃপাময় অবতার’ চৈতন্যদেব জগাই মাধাইয়ের মতো পাষণ্ডকে ‘দলন’ করলেন ‘হরিভাবে দৃঢ়মনা’ করে। ‘জীবে প্রেমরস’ দিয়ে তিনি সকলকে নিস্তার করলেন।<sup>১২</sup> পাষণ্ড দলনের প্রসঙ্গ ভারহরণের ইঙ্গিতবাহী। প্রেমরস প্রচারের মাধ্যমে সকলকে ‘নিস্তার’ করার প্রসঙ্গটিও বড়োজোর গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা ‘বহিরঙ্গ’ কারণ বলতে পারি। দু’দিক থেকেই মুকুন্দের কাব্যের চৈতন্য সংক্রান্ত বয়ান গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুকুন্দের ঈশ্বর পরবর্তী সময়ের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল রচনা করেছিলেন ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই কাব্যের চৈতন্য বন্দনা অংশ পড়লে দেখা যাবে, রাখাপ্রেম মাধুর্য আত্মদানের বদলে জীব উদ্ধারকেই চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ বলা হল—‘জীব নিস্তারিতে যার : কলিয়ুগে অবতার’। পাশাপাশি, অবতারী নয়, বরং বিষ্ণু বা নারায়ণের অবতার হিসাবে চৈতন্যদেবকে যেন দেখতে চাওয়া হচ্ছে এই অংশে—‘শচী পুরন্দর ধন্যঃ যার পুত্র শ্রীচৈতন্যঃ চতুর্ভুজরূপে নারায়ণ’।<sup>১৩</sup> সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল এর বিশিষ্ট কবি রামদাস আদক তো স্পষ্টই বলেছেন, দুষ্টের দণ্ডদাতা আর সজ্জনের বন্ধু হিসাবে পাষণ্ড দলন করে পৃথিবীকে রক্ষা করতেই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব—‘দুষ্টের দণ্ডক তুমি সজ্জনের সখা।/পাষণ্ড দলন করি ধরা কর রক্ষা।।’ রামদাস আদকের বর্ণনা অনুযায়ী গোলকে লক্ষ্মীর সঙ্গে হরি বসে ছিলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মা জগতের দুর্দশা নিবেদন করছেন হরিকে। এই বিবরণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের বিরোধী। বিষ্ণু লক্ষ্মীর স্বকীয়া সম্পর্ক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বে বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। উপরন্তু, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতে, বিষ্ণু নন, কৃষ্ণই গোলকের অধিপতি। তিনিই হুদিনীশক্তি রাখার সঙ্গে নিত্যলীলায় রত। সুতরাং, কৃষ্ণই অবতারী, বিষ্ণু অবতার—এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সঙ্গে রামদাস আদকের বয়ান মেলে না। সম্ভবত, মঙ্গলকাব্যের অধিকাংশ কবিই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকের তুলনায় প্রচলিত ধারণাকেই এ প্রসঙ্গে অনুসরণ করেছেন। তবে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল এর কবি মানিকরাম গাঙ্গুলী চৈতন্যদেব প্রসঙ্গ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত ছিলেন বলা চলে। নামসংকীর্তন ধর্মপ্রচারকেই চৈতন্য আবির্ভাবের প্রধান দিক বলে বিবেচনা করলেও ‘শ্রীমতি রাখার ভাবে রসের তরঙ্গ’ উক্তির মাধ্যমে চৈতন্যদেবের ‘রাখাভাবদ্যুতি সুবলিত কৃষ্ণরূপ’ এর বৃন্দাবনী তত্ত্বকে স্বীকৃতি দিলেন।<sup>১৪</sup> লক্ষ্মণীয়, বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মতের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও চৈতন্য আবির্ভাবের কারণ অনুসন্ধানের প্রক্ষেপে নামসংকীর্তনকে প্রধান দিক বলে বিবেচনা করে মানিকরাম কিন্তু শেষ অবধি ঝুঁকে থাকলেন বঙ্গদেশের বৈষ্ণব মহলের সিদ্ধান্তের দিকেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরেক কবি রামেশ্বরের শিবায়ন এও চৈতন্যদেব অবতারী নন; অবতার—

‘ভুবন তারিতে ভক্তিরূপী নারায়ণ।

নবদ্বীপে শচীর উদরে অধিষ্ঠান।।’<sup>১৫</sup>

আবার, ‘ভুবন তারিতে’ শব্দের মধ্যেও জগৎবাসীকে নিস্তার করা, ভারহরণ ইত্যাদি অনুষঙ্গ আছে। দেখা যাচ্ছে, ‘ভারহরণ’কে যতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অবতারী শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য থেকে বাদ দিন না কেন, জনপ্রিয়



ধারণায় চৈতন্যদেব অনেক বেশি করে 'অবতার' এবং 'ভারতরক্ষাকারী' হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। এই সূত্রেই কালক্রমে ঈশ্বর ভঙ্গ করে বলা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ কবি কৃষ্ণরাম দাসও তাঁর কালিকামঙ্গল-এ মৎস্য অবতার ইত্যাদির বন্দনার ক্রম ধরে এগিয়েই চৈতন্য অবতারের বন্দনা করেছেন।<sup>৪৯</sup>

অবশ্য এই সূত্রে আমরা বৃন্দাবনের গোস্বামী সিদ্ধান্তের সঙ্গে বঙ্গদেশের ভাবনার কোন একমাত্রিক দূরত্ব বা বৈপরীত্যের কথা বলছি না। অবতারের ধারণা ভারতবর্ষের ধর্মসংস্কৃতিতে প্রবলভাবে স্বীকৃত বলেই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে আমরা এই ধারণার ছাপ দেখতে পাব। বৃন্দাবনী ধারণায় চৈতন্যদেবকে 'অবতারী' হিসাবে দেখার যে সূত্রপাত, সেই ধারণাকে এপ্রসঙ্গে অনেকটা স্বীকার করে বেশ কিছু ধর্মসম্প্রদায়ের গুরুকে চৈতন্যদেবের 'অবতার' হিসাবে দেখার রেওয়াজ রয়েছে। নিত্যানন্দপুত্র বীরভদ্র অনেকক্ষেত্রেই বৈষ্ণব পরম্পরায় চৈতন্যদেবের 'অবতার' হিসাবে স্বীকৃত। অদ্বৈত আচার্যের পুত্র অচ্যুতানন্দও একটি বৈষ্ণবগ্রন্থের মতে চৈতন্যদেবের অবতার—

‘অচ্যুতানন্দ আমি একই শরীর।

ভেদ বুদ্ধি কদাচিৎ না করিও স্বীর।’<sup>৫০</sup>

কর্তাভঙ্গ্য সম্প্রদায়ও মনে করে চৈতন্য মহাপ্রভু তিরোধানের পর আউলেচাঁদ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।<sup>৫১</sup> এসবের পাশাপাশিই আবার মনে পড়ে যায়, অদ্বৈত আচার্যের পুত্র কামদেব নাগরের শাখা চৈতন্যদেবকে অবতার হিসাবে স্বীকারই করেনি।<sup>৫২</sup> এসব দৃষ্টান্তই যেকোন প্রকার একমাত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে বাধা। বরং, অবতারতত্ত্বের প্রস্টটাকে কেন্দ্রে রেখেই আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক আর দার্শনিক অবস্থানগত বিশিষ্টতা।

## উল্লেখপঞ্জি

১. P.V. Kane, *History of Dharmasastra* (Vol. II, Part II), Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute, Third Edition, 1997, P. 717-719।
২. সুশীলকুমার দে ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *ভারতকোষ* (১ম খণ্ড), কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ফ্যাক্সিমিলি সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪২৪, পৃ. ৭৬।
৩. P.V. Kane, *History of Dharmasastra* (Vol. II, Part II), P. 720।
৪. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১ম খণ্ড), নয়া দিল্লি, সাহিত্য অকাদেমি, অষ্টম মুদ্রণ, ২০১১, পৃ. ১২৫।
৫. James Hastings (ed.) *Encyclopedia of Religion and Ethics* (Vol. VII), T. & T. Clark, Edinburgh, 1st Published, 1914, P. 193।
৬. অভিজিত সাধুর্থা, 'বৃন্দাবতার ও ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধধর্মের আন্তঃসম্পর্ক', জ্যোতি, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, ২০১৬, পৃ. ৫১।
৭. S.L. Katre, 'Avatars of God', Allahabad University Studies, Vol. X (Arts & Science), Senate House, Allahabad, 1934, P. 42-45.
৮. Freda Matchett, *Krsna : Lord or Avatara ? The Relationship Between Krsna and Visnu*, Routledge, 1st Published, 2001, P. 4।
৯. বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্রভ (সম্পাদিত), *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ১।
১০. সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *রামায়ণ কৃত্তিবাস পণ্ডিত বিরচিত*, কলকাতা : ভারবি, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, পৃ. ১০৬।
১১. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শূন্য-পুরাণ রামাই পণ্ডিত বিরচিত*, কলকাতা : বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, শোভিত

## OPEN EYES

- সংস্করণ, ১৪২০, পৃ. ১৫৬-১৫৮।
১৯. বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৭৬।
  ২০. ড. বিজন গোস্বামী (অনুবাদিত ও সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত বা মুরারি গুপ্তের কড়চা*, কলকাতা : মহেশ, প্রথম মহেশ সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৬-১৭।
  ২১. তদেব, পৃ. ১৯।
  ২২. তদেব, পৃ. ৩।
  ২৩. বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, পৃ. ৯০, ১০০।
  ২৪. প্রেমদাস মহানুভব (অনুবাদিত), *শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক*, কলিকাতা : কমলাসন যন্ত্র, প্রথম প্রকাশ, ১৭৭৫ শকাব্দ, পৃ. ৯-১১।
  ২৫. প্রাণকিশোর গোস্বামী (সম্পাদিত), *শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত (মহাকাব্যম্)*, কলিকাতা : শ্রী প্রাণকিশোর গোস্বামী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৮, পৃ. ৩।
  ২৬. বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, পৃ. ১০১।
  ২৭. সুকুমার সেন (সম্পাদিত), *বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত*, নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ৫।
  ২৮. বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, পৃ. ২৩১।
  ২৯. তদেব, পৃ. ২২৫-২২৬।
  ৩০. সুখময় মুখোপাধ্যায় ও সুমঙ্গল রাণা (সম্পাদিত), *জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল*, বিশ্বভারতী : গবেষণা প্রকাশন বিভাগ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, পৃ. ৫-৭।
  ৩১. বিমানবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান*, পৃ. ২৫৫।
  ৩২. বিশ্বরঞ্জন ঘোড়াই (সম্পাদিত), *লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল*, কলকাতা : সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ৩০-৩১।
  ৩৩. তদেব, পৃ. ১৪।
  ৩৪. S.K. De, *Bengal's Contribution to Sanskrit Literature and Studies in Bengal Vaisnavism*, New Delhi : Today & Tomorrow's Printers & Publishers, Reprint, 1974, P. 125-126।
  ৩৫. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, *অবতারী ও অবতার*, কলিকাতা : সুন্দরানন্দ দাস বিদ্যাবিনোদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৭, পৃ. ১১-২১।
  ৩৬. শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, কলকাতা : দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮, পৃ. ৪৪।
  ৩৭. তদেব, পৃ. ৪৫।
  ৩৮. রাখাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি লীলা)*, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, ১৪২২, পৃ. ১১।
  ৩৯. তদেব, পৃ. ২০।
  ৪০. Rebecca J Manring, *The Fading Light of Advaita Acharya*, New York : Oxford University Press, 1st Published, 2011, P. 23।
  ৪১. মাখনলাল দাস ভাগবতভূষণ, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, কলিকাতা : রাখালদাস বরট, প্রথম প্রকাশ, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৮, পৃ. ১-৩।
  ৪২. শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ৩৪।
  ৪৩. রাখাগোবিন্দ নাথ (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদি লীলা)*, পৃ. ১৭৫, ১৮০।
  ৪৪. প্রাণগোপাল গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন, *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা ১ম-১৭শ পরিচ্ছেদ)*, রাখাকুণ্ড : যদুগোপাল গোস্বামী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৪, পৃ. ২৪০-২৪১।

৩৮. শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*, পৃ. ২৪৬।
৩৯. সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, *অবতারণী ও অবতার*, পৃ. ৭৩।
৪০. Freda Matchett, *Krsna : Lord or Avatara ? The Relationship Between Krsna and Visnu*, P. 177-180।
৪১. তদেব, পৃ. ১৮৩-১৮৪।
৪২. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, *কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৯, পৃ. ১৮২।
৪৩. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য*, কলিকাতা : কবি ও কবিতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৯, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮।
৪৩. পঞ্চানন মণ্ডল (সম্পাদিত), *মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল*, কলকাতা : ভারবি, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭, পৃ. ৩১।
৪৫. তদেব, পৃ. ৬০-৬১।
৪৬. অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব (সম্পাদিত), *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিরচিত মনসামঙ্গল*, কলিকাতা : লেখাপড়া, প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ. ৩।
৪৭. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, 'বৈষ্ণবেতর বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব', *জগদীশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), চৈতন্য প্রসঙ্গ*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২১, পৃ. ১৯৭-১৯৯।
৪৮. যোগিলাল হালদার (সম্পাদিত), *রামেশ্বরের শিব সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন*, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৯।
৪৯. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী*, কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ৫।
৫০. রবীন্দ্রনাথ মাইতি, *হরিচরণ দাসের অষ্টমঙ্গল*, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৩, পৃ. ২০৫।
৫১. অক্ষয়কুমার দত্ত, *ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়* (প্রথম ভাগ), কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৪১৫, পৃ. ২২২।
৫২. Ramakanta Chakrabarty, *Vaisnavism in Bengal*, Calcutta : Sanskrit Pustak Bhandar, 1st Published, 1985, P. 129।

---

অভিজিত সাধুখাঁ  
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,  
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

## ব্রাত্যকবি ঈশ্বর গুপ্ত শ্রীবাস বিশ্বাস

সাংবাদিকতার আদি পথ প্রদর্শক, সংবাদ প্রভাকরের জনক ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সমকালীন বঙ্গদেশের খ্যাতিমান কবি। তাঁর কবিতায় ছিল পুরাতন যুগের শেষ টান ও নতুন যুগের শুরুর টান, যার মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন যুগসন্ধির কবি। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হয়েও কবি ঈশ্বর গুপ্ত আজকের দিনে ব্রাত্য। কিন্তু কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এই নিবন্ধের অবতারণা।

১২১৮ বঙ্গাব্দে কাঁচরাপাড়ার এক বৈদ্য বংশে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় শিশুকালেই। কথিত আছে ঈশ্বর গুপ্তের যখন তিন বছর বয়স, তখন তিনি একবার কলকাতায় মামাবাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লে কিছুদিন তাঁকে শয্যাগত হয়ে থাকতে হয়। সেই সময় তখনকার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত শয্যাগত থেকে সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদিন স্বতঃই আবৃত্তি করতে থাকেন—

“রেতে মশা দিনে মাছি  
এই তাড়িয়ে কলকেতায় আছি।”<sup>১</sup>

মাত্র তিন বছর বয়সে যাঁর মুখ থেকে এ ধরনের কবিতা বের হয়, তাঁর সৃষ্টিতে বড়ো কিছু থাকবে, এ ভাবনা অমূলক নয়। মূলত কবিতা ছিল তাঁর বংশ ধারায়। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন প্রকাশ ভদ্রির সহজাত প্রেরণা। পয়ার-ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দ ছিল তাঁর অধিগত। যখন তখন যে সে বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতে পারতেন। অবলীলাক্রমে গান বাঁধা থেকে শুরু করে যে কোনো আসরে দাঁড়িয়ে গলা মেলাতে দ্বিধাবোধ করতেন না। কবিগান, পাঁচালী, আখড়াই, হাফ আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ ছিল। আজীবন কবিগানের আসর এবং কবিতাপাঠের আসরে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। একসময় কবিগান বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় কবিগান এবং কবিওয়ালাদের উদ্ধার করে বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ধারাকে রক্ষা করেছিলেন। অপরদিকে তিনি তাঁর সমকালে কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্য আসরে আহ্বান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ইংরেজদের অনুকরণ করতে গিয়ে বাংলা সমাজের পরিবর্তনের কথা, বাঙালির বারো মাসের তেরো পার্বণের বর্ণনা, প্রকৃতির বর্ণনা, সমাজের বর্ণনা প্রভৃতি ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে উঠে এসেছে। একদিকে পুরাতন সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, আবার অন্যদিকে নব্য সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ এ দুয়ের টানাপোড়েনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হয়ে উঠেছিলেন যুগসন্ধির কবি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের লেখা গদ্য ও কবিতার মধ্যে মূলত ধরা পড়েছে কবির বাঙালিয়ানা। তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালি কবি। যার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

“খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্তি হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই।”<sup>২</sup>

সত্যিই যো নেই কারণ গরীব বাঙালির ছেলে সাহেব হয়ে যখন মোচার ঘণ্টকে চিনতে পারে না তখন বিশ্বাসের

বিশ্বাস, শ্রীবাস : ব্রাত্যকবি ঈশ্বর গুপ্ত

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 1, June 2022, Page : 14-20, ISSN 2249-4332

অবকাশ থাকে না। অনেক বোঝাবার পর শেষপর্যন্ত স্থির করে নেয় মোচা হল ‘কেলা কা ফুল’। আমরা সেই মতো এখন অনেকেই ‘কেলা কা ফুল’ বলতে শিখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

“আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।”<sup>১</sup>

এখানেই ঈশ্বর গুপ্তের খাঁটি বাঙালিয়ানা। বাঙালি কবি সর্বদাই ছিলেন স্বদেশপ্রেমে মগ্ন। যে কারণে পরাধীন ভারতের মুক্তির চিন্তা তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল। সে সময় বাঙালির অকর্মণ্যতা তাঁর চোখে পড়েছিল। তাই ‘ভারত-সম্ভানের প্রতি’ কবিতায় দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত বাঙালিকে আলস্য বেড়ে ফেলে দেশের মঙ্গল কামনায় অগ্রসর হতে বলেছেন—

“উঠ উঠ শয্যা ছাড় সুয়ে কেন আর।

বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার।”

এভাবে দেশের দশের মঙ্গলের জন্য সজাগ ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। স্বদেশের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসা ছিল গভীরতম। সেজন্য বিলাতি সভ্যতার সংস্কৃতিকে খিকার জানাতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি সরস ভঙ্গিতে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় নির্দিষ্টায় ‘ইংরাজী নববর্ষ’ কবিতায় বলতে পেরেছেন—

“ধন্য রে বোতলবাসি ধন্য লাল জল

ধন্য ধন্য বিলাতের সভ্যতার বল।”

তাঁর এই রঙ্গ-ব্যঙ্গতার মধ্যেই উদ্ভাসিত হয়েছে বাঙালির প্রতি, স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ এবং ভালোবাসা। দেশপ্রেমের আবেগে তাইতো কবি ‘স্বদেশ’ কবিতায় বলে ওঠেন—

“ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে

প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।

কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি

বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।”

মাতৃভাষার প্রতি কবির ছিল মায়ের মতো টান। কারণ তিনি জানতেন শিশু তার মায়ের কাছ থেকে যত সহজে এবং তাড়াতাড়ি শিখতে পারে তা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। তেমনি মাতৃভাষার মধ্য দিয়ে নিজের ভাবনা চিন্তা অনুভূতিকে যতটা গভীরভাবে প্রকাশ করা সম্ভব তা অন্য ভাষায় সম্ভব নয়। কবির এই অনুভবের কথা ব্যক্ত হয়েছে ‘মাতৃভাষা’ কবিতায়—

“যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণ গীত

বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।

মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা

তুমি তার সেবা কর সুখে।”

কবির ‘স্বদেশ’ কবিতায় একই কথা ঘোষিত হয়েছে—

“বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা পুরাও তাহার আশা

দেশে কর বিদ্যাবিতরণ।”

মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসার টানেই ঈশ্বর গুপ্তের লেখনীর ভাষা হয়ে উঠেছিল একেবারে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা, যা অত্যন্ত সহজ-সরল। যেখানে ভাষার অলংকার মাত্রা ছন্দে মূল বক্তব্য ভারাক্রান্ত না হয়ে ভাষা হয়ে উঠেছিল প্রাণের খোরাক। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যবহৃত সহজ-সরল বাংলা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

“এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।”<sup>২</sup>

## OPEN EYES

বঙ্কিমের এ ধরনের কথা থেকেই আমরা অনুভব করতে পারি ঈশ্বর গুপ্তের বাঙালিয়ানার মধ্যে মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির প্রতি আন্তরিকতা কতখানি ছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ‘বাঙ্গালা ভাষা’ নামক প্রবন্ধে মাতৃভাষা তথা মানুষের মুখের ভাষাকে গুরুত্ব দেবার কথা বলেছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথ তো মাতৃভাষাকে বলেছিলেন ‘মাতৃদুগ্ধসম’। কিন্তু এঁদের অনেক আগে ঈশ্বর গুপ্ত মাতৃভাষা নিয়ে যতটা ভেবেছিলেন তা বোধ হয় অন্য কোনো বাঙালি তাঁর মতো করে ভাবেননি।

বাঙালি খাদ্যরসিক। তাই খেতে ভালোবাসেন, খাওয়াতেও ভালোবাসেন। বাঙালির সেই খাবারের মাহাত্ম্যের কথা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ও উঠে এসেছে। কবি হেমন্তে বিবিধ খাদ্য কবিতায় চিংড়ির মাহাত্ম্য নিয়ে লিখেছেন—

“জলের ভিতর মাছ কত রসভরা।

দাড়ি-গোঁপ জটাধারী জামামোজা পরা।।”

খাদ্যরসিক ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর কবিতায় নানারকম খাদ্যের বর্ণনা দিয়ে আমাদের কখনও হাসিয়েছেন কখনও বা রসনাকে বাড়িয়ে দিয়েছেন। পরমার্থ কবিতায় কবির ভাবনায় উঠে এসেছে আধ্যাত্মিকতা—

“শ্রীতি যদি রাখ তুমি জগতের প্রতি।

করিবে তোমার প্রতি জগতের পতি।”

প্রার্থনা কবিতায় কখনো বলেছেন—

“এতদিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।

হই হই করিতেছি, ভবের সভায়।”

কিছু ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় নারীবিদ্বেষী ভাব ফুটে উঠেছে। আসলে উচ্ছৃঙ্খল ইয়ংবেঙ্গলদের প্রভাবে সমকালীন মেয়েরাও বিপদগামী হয় কিনা সে বিষয়েও ঈশ্বর গুপ্তের মনে আতঙ্ক ছিল। তাই নারীদের হাবভাব দেখে দুর্ভিক্ষ কবিতায় বলেছেন—

“আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রত ধর্ম করতে সবে।

একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে?

যত ছুড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,

তখন এ বি শিখে বিবি সেজে বিলাতি বোল কবেই কবে।”

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় উঠে এসেছে নানা উৎসবের কথা। একে তো বাঙালির ‘বারোমাসে তেরো পার্বণ’। ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টি সেদিকে পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাই তো তিনি সগর্বে পৌষপার্বণ কবিতায় বলতে পেরেছেন—

“সুখের শিশিরকাল সুখে পূর্ণ ধরা।

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।”

গুপ্তকবি ছিলেন লোকসংস্কৃতির গবেষণার কাজের পথ প্রদর্শক। তিনিই প্রথম অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর কবিগান এবং কবিওয়ালাদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এই গবেষণামূলক কাজের সূচনা করে বাংলা সাহিত্যে একটা নতুন দিগন্ত খুলে দিলেন। বিশেষ করে ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানা রকম গবেষণামূলক কাজের মাধ্যমে কবিগান ও কবিওয়ালাদের সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। যে কাজটি ঈশ্বর গুপ্ত না করলে হয়তো বাংলা সাহিত্যের এই দিকগুলি সম্পর্কে বহু তথ্য আমাদের কাছে অজানা থেকে যেত।

ঈশ্বর গুপ্তের এই গবেষণা, পরিশ্রম এবং লোকসংস্কৃতির আখার সংগ্রহ একজন বড়মাপের ঐতিহাসিক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। তাঁর জীবনধারা পর্যালোচনা করলে জানা যায়—তিনি বহু বছর ধরে পশ্চিমবাংলার এমনকি পশ্চিম বাংলার বাইরেও বহু গ্রাম ঘুরেছেন। বিশেষ করে নদিয়া, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এমনকি ঢাকার (বাংলাদেশের) সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। ঐ সব অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম তন্ন তন্ন করে খুঁজে সংগ্রহ

করেছেন কবিতা, কবিগান, কবিওয়ালাদের পরিচয়। বহু এলাকা পর্যবেক্ষণের সূত্রেই ঈশ্বর গুপ্ত যে সব কবিওয়ালাদের জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করেছিলেন তাঁরা হলেন— কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), নিত্যানন্দ দাসবৈরাগী (নিতাই বৈরাগী), হরঠাকুর, রাসু, নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, কেটামুচী, লালু নন্দলাল, গৌজলা গুঁই প্রমুখ।

কবিওয়ালাদের জীবনী এবং রচনা সংগ্রহ করে বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের একটা অনালোচিত দিকের উন্মোচন ঘটালেন তিনি এবং লুপ্তখন উদ্ধার করে বাংলা সাহিত্য ধারাকে সংবর্ধিত করলেন। সেইসঙ্গে উত্তরসূরীদের অনুপ্রাণিত করলেন লোকসংস্কৃতির আধার সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের দিকে।

ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন একজন সাংবাদিক এবং সেকালের একজন সেরা পত্রিকা সম্পাদক। তাঁর সম্পাদনায় ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ২৮শে জানুয়ারি সাপ্তাহিক ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই জুন থেকে দৈনিক প্রভাকর প্রকাশিত হতে থাকে। বাঙালি সম্পাদিত এটিই বাংলাদেশের প্রথম দৈনিক বাংলা পত্রিকা। নিজে এই সংবাদ প্রভাকরের মাধ্যমে বহু মানুষকে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরবর্তীকালে অনেকেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী প্রমুখরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

“নবীন লেখকদের জন্য সে সময় জনপ্রিয় ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকার পৃষ্ঠা ছেড়ে দেওয়া কম কথা নয়। সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তের প্রবল সাহিত্য প্রীতির এ এক মস্ত বড় দৃষ্টান্ত। বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি তিনি চেয়েছিলেন এবং সেটা আধুনিকতাকে মেনে নিয়েই।”<sup>৬</sup>

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা ছিল একটি কবিতা যা ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকরেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রকাশ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

“আমি নিজে প্রভাকরের নিকট বিশেষ খণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।”<sup>৭</sup>

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের এহেন মন্তব্য থেকে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের ভূমিকা সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারি।

সেকালে সংবাদ প্রভাকরে সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি ধর্ম সমাজ সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ক নানা লেখা প্রকাশ পেত। এছাড়া সমকালে এই পত্রিকাকে হাতিয়ার করে ব্রিটিশ শাসনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের বিভিন্ন কাজের নিন্দা এবং সমালোচনা করেছিলেন। এটা ঈশ্বর গুপ্তের সাহসী পদক্ষেপ বলতেই হয়। তিনি যুক্তি দিয়ে সংবাদ প্রভাকরে লিখেছেন বাংলাদেশ ব্রিটিশদের সর্বাধিক রাজস্ব দেয়। অথচ ব্রিটিশ যত পেয়েছে তত শোষণ চালিয়েছে। অকপটে ঈশ্বর গুপ্ত যে সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তারও প্রায় একশো বছর পরে ভারত স্বাধীন হয়েছে। এটা শুধু দুঃখের নয় লজ্জারও বটে।

‘সংবাদ প্রভাকর’ ছাড়াও ঈশ্বর গুপ্ত আরও কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। সেগুলি হল— ‘সংবাদ রত্নাবলী’ (১৯৩২), ‘পাষাণ পীড়ন’ (১৯৪৬), ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ (১৯৪৭), ‘সংবাদ দ্বিজরাম’ (এই পত্রিকার কোনো সংখ্যা পাওয়া যায় না)। এর মধ্যে ‘সংবাদ সাধুরঞ্জন’ নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম রচনা একটি কবিতা ‘মানব চরিত্র’ প্রকাশিত হয়। সংবাদ পত্রগুলির সবগুলি প্রতিষ্ঠা পায়নি একথা সত্য, কিন্তু সমকালে বেশকিছু দায়িত্ব পালন করেছিল। তবে একজন লোকের পক্ষে এতগুলি পত্রিকা সম্পাদনা করা খুব সহজ কাজ নয়। ঈশ্বর গুপ্ত এ কাজটি পেরেছিলেন।

উল্লিখিত পত্র পত্রিকাগুলির মধ্যে সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নামটি একাত্ম হয়ে গেছে। কেননা এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করেই তাঁর যত উত্থান পতন, নিন্দা প্রশংসা জুটেছিল। তাই ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে সংবাদ প্রভাকরের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যাবে না। বাংলা সাহিত্যের একজন যশস্বী অধ্যাপিকা লিখেছেন—

## OPEN EYES

“সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত আসলে সংবাদপত্রের যে সমকালীনতা ও আধুনিকতা তারই ভাষ্যকার। তাই সমকালীন প্রগতিশীল মানুষের চিন্তাচেতনাকে তাঁর সংবাদপত্রে তিনি যেমন প্রকাশ করেছেন, তেমনি নিজের প্রগতিশীলতার পরিচয় রেখেছেন।”

সেকালের সঙ্গে একালের যদি তুলনা করা হয় তবে দেখা যায় আধুনিককালে সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সম্ভা পলিটিক্স ঢুকে গেছে। অনেকটা বাণিজ্যিক হয়ে উঠেছে। এতে সংবাদের স্বচ্ছতা অনেক কমে গেছে। কিন্তু সেকালে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ঈশ্বর গুপ্ত যে স্পর্ধা নিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যান্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেন এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির আশায় বিষয় নিষ্ঠ আলোচনা করতেন, তাতে এখন অনেকটাই ভাটা পড়ে গেছে। এখন সংবাদপত্র এবং সংবাদ মাধ্যমগুলি খবর তৈরির জন্য ব্যস্ত থাকেন। এর জন্য বেশির ভাগ সময়ই তারা তাবোদারি করেন। ফলে আগে যা সংবাদ ছিল এখন তা খবরে পরিণত হয়েছে। এখন খবরের জন্য খবর করা হয়। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদপত্রে যেভাবে নারীশিক্ষা, শিল্পবিদ্যা, ইংরাজি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা, কৃষি, অর্থনীতি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় নিয়ে স্বদেশবাসীর জন্য ভেবেছিলেন তা যদি সঠিকভাবে কার্যকর করা যেত তবে বাংলা তথা বাঙালির চেহারা পালটে যেত এবং বাংলা হয়ে উঠতো সবার সেরা।

এত প্রতিভার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আজকের দিনে ঈশ্বর গুপ্তের কথা সেভাবে শোনা যায় না। কারণ—

প্রথমতঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদা ও রুচির পরিবর্তন ঘটে। সেদিক থেকে মধুসূদন বক্রিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ নজরুল প্রমুখ ছাড়া বাকী বহু প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিক স্মৃতির অগোচরে চলে গেছেন। এক কালের প্রতিভাবান বহু কবি সাহিত্যিককে আজ আর আমরা স্মরণ করি না। সেই চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী শুধু নয়, আরও একাধিক কারণে এত বড় প্রতিভাবান কবি ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাত্য হয়ে পড়েছেন।

দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শনের স্পর্শে আধুনিক জীবনে মানুষের চিন্তা ভাবনার, রুচির অনেক বদল ঘটেছে, যার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের অবস্থান হয়নি। উনিশ শতকের শেষদিক থেকে কলকাতা নির্ভর বাংলা সাহিত্য পাঠকের মনকে যেভাবে জয় করে আসছে তার মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম প্রায় শোনাই যায় না।

তৃতীয়তঃ ঈশ্বর গুপ্ত দীর্ঘকাল গ্রাম বাংলায় ঘুরে ঘুরে কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনকথা সংগ্রহ করেছিলেন এবং যে সমস্ত লুপ্ত সম্পদ রক্ষা করেছিলেন তার মূল্য অপরিমিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, লোকে এখন আর কবিগান শোনেন না। কবিগান আজ আর বেঁচে নেই, কোনো মতে টিকে আছে। ফলে গুপ্ত কবির পরিশ্রমের কথা আজ আর কেউ ভাবেন না।

চতুর্থতঃ অতি সাধারণ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত কবিতা লিখেছেন। এক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা যেতে পারে তা ঈশ্বর গুপ্তের আগে কোনো বাঙালি কবি ভাবতে পারেননি। সাধারণ চিংড়ির মাহাত্ম্য যে কত রকমের হতে পারে তা ঈশ্বর গুপ্তের মতো কবিরাই ভাবতে পেরেছেন। অথচ বর্তমানের পাঠক শ্রোতার সে সব রচনার মধ্যে গভীরতর কিছু খুঁজে পান না।

পঞ্চমতঃ একসময় কবিকে রাজানুগ্রহ বা প্রজার বা সমকালীন পাঠকের মন রক্ষা করে কবিতা লিখতে হয়েছে। যার ফলে সেগুলি সব ভালো কবিতা হয়ে ওঠেনি। সেই সব স্থূল কবিতা এখনকার মানুষের মনকে নাড়া দেয় না।

ষষ্ঠতঃ কখনও অশ্লীলতা (যেমন বিধবা-বিবাহকে নিয়ে লিখেছেন—‘অনেকেই এই মত লতেছে বিধান। / ‘অক্ষত যোনি’র বটে বিবাহ বিধান।।’), কখনও অত্যধিক ব্যঙ্গতা (বিড়ালক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে। / আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে।।), কখনও মেয়েদের প্রতি, বিশেষ করে ইংরাজি শিক্ষার নামে মেয়েদের বেলোজ্ঞেপনা নিয়ে কবির রক্ষণশীল মনোভাব—(আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো ব্রত ধর্ম করতো সবে। / একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে? ...) কবিকে অনেকটা দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

সপ্তমতঃ বক্রিমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে বলেছেন—তাঁর মধ্যে ছিল মার্জিত রুচির অভাব এবং উচ্চ লক্ষ্যের



অভাব। আবার কারও কারও দৃষ্টিতে ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন প্রাচীনপন্থী কবি। ফলে তারা তাঁর কবিতাকে পাশে সরিয়ে রাখেন।

অষ্টমতঃ ঈশ্বর গুপ্ত কোনো বিদেশি কবির দ্বারা প্রভাবিত হননি। শুধুমাত্র বাঙালির মনের কথা, বাঙালির প্রাণের কথা বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই বাঙালিয়ানার বাইরে তাঁর মন প্রসারিত হয়নি। ফলে ঈশ্বর গুপ্ত নামটি আজ শুধু টিকে আছে। সাধারণ পাঠকসমাজ সাম্প্রতিককালে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যে কোনো প্রাণের জিনিস বা ভালোলাগার জিনিস খুঁজে পান না, তাই ঈশ্বর গুপ্ত আজ স্মৃতির অগোচরে। আবার দেশ-কাল-ভেদে মানুষের গ্রহণযোগ্যতার বদল ঘটে, যার ফলে ঈশ্বর গুপ্ত সাধারণ মানুষের মন থেকে দূরে সরে গেছেন।

একজন মানুষের সবই ভালো হবে তা তো হয় না। সব ভালো হলে তিনি তো দেবতা হয়ে যাবেন। ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি। মানুষ হিসেবে তাঁর কিছু ভুল ত্রুটি অবশ্যই ছিল। কিন্তু তাঁকে মনে রাখার মতো অনেক গুণই ছিল। গুপ্তকবি সম্পর্কে আশার কথা এইটুকু: বর্তমানে অল্প কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কবির দু'একটি কবিতা পাঠ্য আছে। ঈশ্বর গুপ্তের নামটি টিকে আছে—ঈশ্বর গুপ্তের জন্মভিটা, ঈশ্বর গুপ্ত পাঠাগার, ঈশ্বর গুপ্ত সেতু, কবি ঈশ্বর গুপ্ত রোড, কবি ঈশ্বর গুপ্ত লেন, ঈশ্বর গুপ্ত পরিষদ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। সম্প্রতি কল্যাণী বুদ্ধপার্কের পাশে চৌরাস্তার মাঝখানে ঈশ্বর গুপ্তের একটি মূর্তি বসেছে। এসবই একেবারে সংকীর্ণ সীমার (কল্যাণী-কাঁচরাপাড়ার) মধ্যে। একথা শুনে কেউ কেউ হয়তো বলবেন যা হচ্ছে সেটুকুই বা কম কিসে? এইটুকুই আশার কথা। তবে আলোচনার উপাত্তে এসে এ কথাটিই বলব যে, সমকালীন এত বড়ো খ্যাতিমান একজন ব্যক্তির বর্তমান এই অবস্থা কেবল হতাশার নয়, দুঃখেরও বটে।

#### তথ্যসূত্র

১. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, সাহিত্যলোক, ২০০৬, পৃ. ৬।
২. তদেব, উপক্রমণিকা অংশ থেকে উদ্ধৃত।
৩. তদেব, ঐ।
৪. তদেব, ঐ।
৫. তাপস বসু, উনিশ শতকের প্রভাতীপর্বের সাংবাদিক সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং একুশ শতকের একটি আলোচনা, ভবেশ মজুমদার সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, পৃ. ১৪।
৬. ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, সাহিত্যলোক, ২০০৬, উপক্রমণিকা অংশ থেকে উদ্ধৃত।
৭. সত্যবতী গিরি, নবজাগরণের নারীকেন্দ্রিক সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও ঈশ্বর গুপ্ত, ভবেশ মজুমদার সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৬, পৃ. ৬১।

#### সহায়ক গ্রন্থ

- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯০।
- অলোক রায় সম্পাদিত, ঈশ্বর গুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি, কলকাতা, ২০১৩।
- বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫) প্রথম খণ্ড, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬২।
- ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০৬।
- ভবেশ মজুমদার সম্পাদিত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সাহিত্য ও সাংবাদিকতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬।

## OPEN EYES

মোহনলাল মিত্র সম্পাদিত, ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, নবভারতী, কলকাতা, ১৯৬৩।

সত্রাজিৎ বসু সম্পাদিত, স্বপ্নকল্পক, প্রজ্জ্বলিত সংখ্যা, বিষয় বিশেষ : ঈশ্বর গুপ্ত, সাম্পান, কলকাতা, ২০১২।

সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার, সাহিত্যসাধক ঈশ্বর গুপ্ত, রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১১।

সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪১৬।

---

শ্রীবাস বিশ্বাস  
সহকারী অধ্যাপক,  
বাংলা বিভাগ, পোলবা মহাবিদ্যালয়,  
পোলব, হুগলি

অভিজিৎ সেন-এর উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি  
টুন্পা দাস

“আজো আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই,  
আজো আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্নত্ব দেখি।  
ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি,  
আজো আমি তন্দ্রার ভেতরে  
এদেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত  
সেই রক্তাক্ত সময়?”

— রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ  
(বাতাসে লাশের গন্ধ পাই)

না এদেশে ভোলেনি সেই দুঃস্বপ্নের রাতকে; সেই রক্তাক্ত সময়ের যন্ত্রণাকে, যারা অন্তরে বহন করে বেঁচে থাকার তাগিদে ভারত সীমান্তের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিল তারা ভুলতে পারেনি সেই শিকড় ছেঁড়ার কান্না। দেশভাগ, দাঙ্গা ও মুক্তিযুদ্ধের সময় সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে, পরিবার পরিজনকে পথে হারিয়ে, ধর্ষিতার যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে যারা বেঁচে ছিল তারা মুক্তিযুদ্ধের ট্রমাকে ভুলতে পারেনি কখনও। ভুলতে পারেনি বলেই ‘নক্ষত্র নদী ও নারী’ (২০১৫ খ্রিঃ) উপন্যাসের কাঞ্চনমালা ধর্ষক হত্যাকারী, ‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা’ (২০০০ খ্রিঃ) উপন্যাসের হেনা মুগীরোগগ্রস্ত, রুমেল্লা সহায় সম্বলহীনা, বাস্তুহারা সরোজ উদ্দেশ্যহীন জীবন পথের পথিক। এই কাল্পনিক চরিত্রগুলির স্রষ্টা এযুগের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক অভিজিৎ সেন। বলাবাহুল্য চরিত্রগুলো কাল্পনিক হলেও সমকালীন সময়ের অনেক নর নারীর বাস্তব প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে তারা; এমনকি ‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা’ উপন্যাসের সরোজের মধ্য দিয়ে লেখকের জীবন ইতিহাসের অনেকগুলি পর্বের সমন্বয় ঘটেছে। দেশবিভাগ, দলীয় রাজনীতি, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের জীবনকে কীভাবে অভিশপ্ত করে তোলে তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে অভিজিৎ সেনের ‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা’ এবং ‘নক্ষত্র নদী ও নারী’ উপন্যাস দুটি।

‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা’ উপন্যাসে লেখক নকশালপত্নী রাজনীতি থেকে সরে আসা সরোজের অজ্ঞাতবাসের কাহিনিকে কেন্দ্র করে এক ভয়ঙ্কর বিপদ সংকুল পরিস্থিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করান। রাজনীতি থেকে সরে আসা সরোজের আকাশের সমস্ত নীলিমাগুলি যখন এক এক করে মুছে যাচ্ছে তখন সরোজ জীবনের আবর্তে ফিরে আসতে চাইছে, বাঁচতে চাইছে নতুনভাবে। মারোর বন্দর শহরে সরোজের অজ্ঞাতবাসের সূত্র ধরে উঠে এসেছে একদিকে নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান ও তার ব্যর্থতা, অন্যদিকে পূর্ববঙ্গের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থীদের অমানবিক জীবন। নিস্তরঙ্গ মারোর বন্দর শহরটি হঠাৎ একদিন মানুষের পদভারে মুখরিত হয়ে উঠতে লাগল; এই পদভার পূর্ববঙ্গ থেকে আসা অসংখ্য শরণার্থীর। মুক্তিযুদ্ধ ও তার পরিস্থিতি মানুষের জীবনকে কীভাবে বিধ্বস্ত করেছে রুমেল্লা ও তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। শরণার্থী শিবিরে হেনার মতো মুক্তিযোদ্ধার পরিণতি পাঠককে চেতনার সেই স্তরে নিয়ে যায় যেখানে ধর্মের বেড়া জাল খড়কুটোর মতো উড়ে যায়, শ্রেণীশত্রু খতমের লড়াই অর্থহীন হয়ে পড়ে। শুধু হেনা নয়, প্রতিবাদী ও নারী স্বাধীনতার পক্ষপাতী রোজী পারভেজের মতো মেয়ের মধ্যে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ‘ধর্ষণ’ শব্দটি প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনকে কীভাবে

দাস, টুন্পা : অভিজিৎ সেন-এর উপন্যাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 1, June 2022, Page : 21-30, ISSN 2249-4332

## OPEN EYES

আলোড়িত করেছিল।

দেশভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির জীবনকে অভিশাপ ও ধ্বংসের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। ‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা’ উপন্যাসে এই অভিশপ্ত জীবনের প্রতিফলন ঘটেছে। একটু পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। অবিভক্ত ভারতের পূর্বদিকে হিন্দুবিরোধী নেতারা দাঙ্গার চক্রান্ত শুরু করে। ফজলুল হক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় গেলে পূর্বপাকিস্তানে হিন্দু বিরোধী নেতারা রটিয়ে দেয় কলকাতায় ফজলুল হককে খুন করা হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি দাবানলের আকার ধারণ করে। এহেন পরিস্থিতিতে নতুন মাটির পোঁজে সরোজ এবং তার ভাই ভারতে আসে। শুরু হয় উদ্বাস্তু জীবন। যাযাবরের মতো ঘুরে ঘুরে জীবন কাটে, সোদপুর থেকে উৎখাত হয়ে অবশেষে সোদপুরেই বাসস্থান মেলে। যে দাঙ্গা সরোজের মতো অসংখ্য মানুষকে ভিটেছাড়া করেছিল তার মূল সত্যটা অনেকদিন পর ধরা পড়ে সরোজের কাছে। অভিজিৎ সেন বলেন—

“দাঙ্গা দাঙ্গা বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করে কিন্তু এটা ঠিক নয়। দাঙ্গা দাঙ্গাবাজদের ঐক্যবদ্ধ তো করেন, ক্রমশ শক্তিশালীও করে। প্রত্যেকটি দাঙ্গার পর দাঙ্গা বিরোধীদের একাংশ দাঙ্গাবাজদের ঐক্যবদ্ধ তো করেছে, ক্রমশ শক্তিশালীও করে। প্রত্যেকটি দাঙ্গার পর দাঙ্গাবিরোধীদের একাংশ দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে যোগ দেয়। একজন দাঙ্গাবিরোধী সবসময় একজন সুপ্ত দাঙ্গাবাজ। .... দাঙ্গা যথার্থই রক্তবীজ।”

এই দাঙ্গা দশ বছর পরে একবার পূর্বভারতে ও চৌদ্দ বছর পরে একবার পশ্চিম ভারতে তাদের বাস্তুচ্যুত করেছিল। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের শরণার্থীদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে। ১৯৫০-৬৪ সালে এই সংখ্যাটা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কারণ পূর্বপাকিস্তানে তখন দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় সরোজের পরিবারের বাকি সকলে ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে চলে আসে কলকাতায়। ১৪ বছর আগে কীর্তনখোলার ঘাটে মায়ের কাছ থেকে বিদায়ের সময় মা ছিলেন যুবতী, লক্ষ্মী প্রতিমার মতো সুন্দরী, আর শিয়ালদহ গিয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা মাকে দেখে সরোজের মনে হয়েছিল রোগগ্রস্ত, বিহ্বল, একটুখানি একজন মানুষ যার চোখে অনিশ্চয়তার আশঙ্কা। এই আশঙ্কা শুধু সরোজের মায়ের নয়, এই আশঙ্কা ছিল লক্ষ লক্ষ বাস্তুচ্যুত নারী পুরুষের।

উদ্বাস্তু জীবনের টানাপোড়েন সমকালীন রাজনীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, যার আঁচ এসে পড়েছিল সরোজের জীবনেও। সবলের উদ্ধত ক্ষমতাকে উৎখাত করার লক্ষ্যে এবং যৌবনের উন্মাদনায় নকশাল আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সরোজ। এই অনিশ্চয়তার রাজনীতি থেকে সরোজ শেষপর্যন্ত সরে এসেছিল এবং নকশাল নিধনের সময়পর্বে আত্মগোপন করে বেনামে মারোর বন্দরে থাকতে শুরু করে। কিন্তু কর্মসূচির মধ্যে যে অসুস্থসারশূন্যতা ছিল, সরোজ বারংবার তার পর্যালোচনা করেছে। তার মনে হয়েছে—

“এই অলীক অথচ ভয়াবহ যুদ্ধের পশ্চাদ্পসরণ নেই, সন্ধি নেই, যুক্তি নেই, আধুনিক অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি নেই, পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত শত্রু নেই কোনো নির্দিষ্ট রণনীতি বা রণকৌশল নেই।”

সরোজের এই উপলব্ধি যথার্থই। তাদের মূল কাজ ছিল জোতদার খুঁজে বের করা। গেরিলা অভ্যুত্থানের কর্মসূচি গ্রহণের সময় রাতের অন্ধকারে তারা গরিব চাষীদের শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব বোঝাত। পার্টির নির্দেশ ছিল গরিব ভূমিহীন চাষিরা গ্রামের জোতদার খতম করবে, ‘শহর থেকে যারা গ্রামে গিয়েছিল তারা জোতদার খতমে হাত লাগাবে না’—তাদের এই নির্দেশ কখনোই বাস্তবায়িত হয়নি। শ্রেণিশত্রু খতমে কখনোই গ্রামের বাসিন্দারা একজেট হয়নি, যেমনভাবে গ্রামে জোতদারের খান কাটার সময় একজেট হত। চারু মজুমদারের বক্তৃতায় সদ্যম্নাত যুবকরাই এই অপারেশন চালাত। ফলে চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে তাদের ব্যর্থতা ক্রমশ প্রকট হতে শুরু করে। সরোজের মনে হয়—

“কৃষকরা তাদের নিয়ে জোতদার খুন করাতে চাচ্ছে নিছক ব্যক্তিগত কিংবা নিতান্তই অর্থনৈতিক,

তাৎক্ষণিক কিছুটা সুবিধা পাওয়ার জন্য। এইভাবে তারা গোপন রেখে বিপ্লবীদের ঠকাতে চেষ্টা করত।”<sup>৭</sup>

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চীন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শগত বিরোধ বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল। পূর্বপাকিস্তানে কমিউনিস্টরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়— চীনপন্থী দল ও সোভিয়েত কমিউনিস্ট দল। চীনপন্থী কমিউনিস্ট দ্বারা গঠিত কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদ লেনিনবাদ) মধ্যেও ৬৬ র পরবর্তী সময় থেকে আদর্শগত প্রক্ষে বিভিন্ন উপদল গঠিত হতে থাকে। বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন নামে একটি উপদলের লক্ষ্য ছিল কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার ও কৃষি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করা। অপর একটি দলের লক্ষ্যও ছিল কৃষি বিপ্লব, তবে এদের মাধ্যম হল সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে জেতদারদের খতম করা। মাও সে-তুং এর ‘গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা’র রণনীতি গ্রহণ করেছিল এই দ্বিতীয় দলের কমিউনিস্টরা। চারু মজুমদারের নকশালবাড়ি অভ্যুত্থান পূর্বপাকিস্তানের এই উপদলীয় নেতৃত্বদের প্রভাবিত করেছিল। শ্রেণিশত্রু দখল, গেরিলাযুদ্ধ, গণসংগঠন বর্জন, নির্বাচন বর্জন প্রভৃতি যে কর্মপন্থাগুলি চারু মজুমদার গ্রহণ করেছিলেন, দ্বিতীয় দলের কমিউনিস্টরা এই কর্মপন্থাগুলিকে মেনে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান চালায়। সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে শ্রমিকদের অভ্যুত্থানের লক্ষ্যে তারা উজ্জীবিত হয়েছিল। পাকিস্তানের মুসলিম লিগ, পূর্বপাকিস্তানের আওয়ামী লিগ সোভিয়েত রাষ্ট্রকে এই কমিউনিস্ট দল তাদের শত্রুরূপে বিবেচনা করতে থাকে। সত্তরের নির্বাচনকে ‘শাসকশ্রেণির প্রহসন’ বলে বিরোধিতা করেছিল এই মাওপন্থী কমিউনিস্টরা। মাওপন্থী কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হওয়া নেতৃত্বদের পদত্যাগ, যথাযথ কর্মসূচির অভাব প্রভৃতি কারণে তারা সফলকাম হতে পারেনি। মাওবাদী দলের মধ্যে এইরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিতে মানুষ তাদের ওপর আস্থা হারায়, বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানিদের অত্যাচার একাধিপত্য ও অন্যদিকে আওয়ামী লিগ যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতার ডাক দিল, স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ জনগণ সেই ডাকে সাড়া দিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে তারা তাদের কর্মসূচি গ্রহণে অকৃতকার্য হয় এবং—

“তাদের গেরিলা ইউনিটগুলি একই সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনী এবং অন্যান্য স্বাধীনতাকামী শক্তিগুলির সঙ্গে লড়াইতে জড়িয়ে পড়ে। .... বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই দ্বিমুখী লড়াইতে তারা অতি দ্রুত ধ্বংস হতে থাকে।”<sup>৮</sup>

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী এই সুযোগকে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন। সেই সময় ব্যাপক আকারে নকশাল নিধনের পরিকল্পনা করা হয়। অভিজিৎ সেন লিখেছেন—

“নকশালবাড়ি একটা দিক নির্দেশক ঘটনা হয়ে যেতে পারে এই অনুমানেই সম্ভবত শাসকশ্রেণি সময় নষ্ট করতে চাইল না। উগ্র বামপন্থা নাম দিয়ে তারা নকশালদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সংসদীয় বামপন্থীরা এ ব্যাপারে তাদের সহায়তাই করল।”<sup>৯</sup>

সংসদীয় বামপন্থী দল সরকারের অংশীদার স্বরূপ। অতএব পরোক্ষ হলেও তাদের সমর্থন জেতদারদের পক্ষে—এই যুক্তিতে সি পি আই (এম) থেকে আরেকটি দল সি পি আই (এম এল) গঠিত হল। এরা সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে ছিল। চারু মজুমদারের নেতৃত্বে এই দল শোষণ মুক্তির উদ্দেশ্যে আপোষহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ১৯৪৮ সালকে মুক্তির দশকে পরিণত করার আহ্বান জানিয়েছিল বর্মার কমিউনিস্ট নেতা থাকিন থানটুন। সেই আহ্বানের বাড়া এসে পড়ে ভারতবর্ষেও। এর কুড়ি বছর পরে সাতের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার ডাক দিয়েছিলেন চারু মজুমদার।

শোষণ মুক্তির উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও অমানবিক ধ্বংসলীলায় মেতে ওঠে তারা। পুলিশ অফিসারদের হত্যার পরিকল্পনা করেছিল, এমনকি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গোপাল সেনকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। ফলে সরকার নকশালদের শক্ত হাতে দমন করতে পুলিশ বিভাগের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। লকাপ হত্যা, জেলবন্দি হত্যা, ভূয়ো সংঘর্ষ দ্বারা অমানবিক হত্যালীলা চালিয়েছে পুলিশ। অভিজিৎ সেন

## OPEN EYES

সশস্ত্র বিপ্লবের প্রতি সামান্য হলেও পক্ষপাতিত্ব করেছিলেন ঠিকই কিন্তু বিপ্লব কখনোই বিশ্বশান্তি, সাম্য, মৈত্রীর প্রধান আয়ুধ হয়ে উঠতে পারে না—এই দিকটি লেখক সূক্ষ্মভাবে স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। আসলে সরোজের অভিজ্ঞতা লেখকের নিজের জীবন অভিজ্ঞতারই বাস্তব প্রতিমূর্তি। তাই সরোজ এই বিপ্লবের ক্রটির কথা বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করলে বন্ধু বলেছিল—

“এই উপমহাদেশের সমাজ বিশ্লেষণ এবং দ্বন্দ্ব গুলির প্রধান প্রধান স্থান নির্ণয় নিয়ে আমাদের ভিতরে নানা ধরনের ভ্রান্তি আছে। আমাদের যাবতীয় ভুলের মূলে আছে এই ভুলটি। ঠিকমতো নিষ্পত্তি না হলে কিসের জন্য আমাদের লড়াই, কে আমাদের শত্রু, কে আমাদের মিত্র, কোথায় এবং কীভাবে আমরা লড়াই শুরু করব এসব যাবতীয় ব্যাপারটি গোলমালে হয়ে যাবে, হয়েছেও তাই।”

পার্টির মতবিরোধ একসময় সরোজের চোখে ধরা পড়ল এবং ব্যাপক আকারে নকশাল নিধন পর্বে সরোজের মনে হল তাদের চিন্তাভাবনা কর্মসূচি কতখানি অলীক ছিল। এ প্রসঙ্গে সমালোচক মন্তব্য করেছেন—

“যৌবনের যে অনির্দেশ্য বেদনার টানে মানুষ হঠাৎ হঠাৎ প্রেমে পড়ে যায় প্রায় সেই কারণেই সরোজের মতো কেউ কেউ বিপ্লবে যোগ দেয়। তাই মোহভঙ্গ হতে বেশি সময় লাগে না। মায়াবোভাষি কেন আত্মহত্যা করল, টলস্টয় এর আনা কারেনিনা কেন এত চিত্তাকর্ষক এই সমস্ত বড় বড় ভাবনায় লালিত টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা হঠাৎ শ্রেণি চরিত্র পাস্টে কৃষক শ্রমিকের মুক্তিদাতা হিসেবে হাজির হলে যা হওয়ার তাই হয়। সারা পৃথিবীতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের ব্যর্থতার একটাই কারণ হয়তো সরোজের ব্যর্থতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।”

নকশাল আন্দোলনের অভ্যুত্থান ও পতন এই উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। মারোর বন্দরে বসবাসকালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সরোজের জীবন বৃত্তে এসে পড়ে সতী ও হেনার পরিবার। শরণার্থী শিবিরে অধ্যক্ষ হিসেবে নানান কাজকর্ম পরিচালনার সূত্রে সতীর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় সরোজ। মুক্তিযুদ্ধে শরণার্থী শিবিরের যন্ত্রণাকে লেখক সতীর পরিবারের মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। একই ঘরের মধ্যে চারটি পরিবারের পনোরো-ষোল জন সদস্যের একত্রবাস। সম্প্রদায়গত বিরোধ, শ্রেণিগত বা দলগত বিরোধ শেষ অবধি হাতাহাতি রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায়। শরণার্থী শিবিরের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন—

“রেডক্রসের তরফে তাৎক্ষণিক প্রয়াস নির্মিত সিঙ্গেটিক সিটের তৈরি পায়খানা স্কুল সংলগ্ন মাঠে সাজানো .... সিঙ্গেটিক অর্গল প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে নিশ্চিহ্ন। চারপাশের স্তূপীকৃত নরকের মধ্যে সকাল থেকে ছড়োছড়ি মারামারি আবেদন নিবেদনের, মিথ্যার, ভানের, স্পর্ধার, রসিকতার, অশ্লীলতার, গৌঁজে ওঠা এক মানুষের জগত। তারপর সারাদিন ধরে এই সমস্ত ছন্দ হারানো মানুষের জগতটা তার যাবতীয় বীভৎসতা নিয়ে চলতে শুরু করে। কান্না, চিৎকার, আত্মফালন, অভিশাপ, মল মূত্র রক্ত-পুঁজ, কবন্ধ, মাতৃ ভ্রূণ, ফুলে ওঠা অস্ত্র, পচে হেজে মরে যাওয়া সমস্ত মানবিক অভ্যাস সম্পর্ক, এই সমস্ত কিছু নিয়ে জীবন চলতে থাকে।”

দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ পূর্বপাকিস্তানের উৎসাহ বৃদ্ধি করেছিল কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তাদের ধর্মগত একাত্মবোধের পদস্থলন ঘটে জাতিগত ঐক্যপ্রীতির কাছে। ভাষা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে। এই আন্দোলনের ঢেউ সতীকে প্রভাবিত করেছিল বলেই রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৬৭-৬৮ সালে সতী কলকাতায় এসেছিল। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনও যাদেরকে বিচলিত করেছিল সতীর স্বামী আবু হেনা সেই দলের নয়। ফলে সংসার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হয় তাকে।

২৫শে মার্চ পাকিস্তানিদের অমানবিক আক্রমণের কিছুদিন পর সতী, তার থেকে পাঁচ ছয় বছরের ছোট বোন হেনা, পঞ্চাশের কাছাকাছি মা রুমেলি ও ষাটোর্ধ্ব মামা আব্দুল কুদ্দুস পাড়ি দেয় ভারত সীমান্তে। তাদের ভারতে

আসার পিছনে দলগত রাজনীতি অনেকটাই প্রভাব ফেলেছিল। সতী ও হেনার বাবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যা ওদেশের রাজনীতির সব থেকে সুবিধাবাদী অংশ। অথচ বর্তমানে তিনি নিখোঁজ। চারু মজুমদারের নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্টদের একাংশে। সেই দলে ছিল হেনাও। ১৯৭০ সালের পুরো সময়টা সে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। মার্চ মাসের মুক্তিযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই হেনাদের লড়াই শুরু হয়েছিল। চারু মজুমদারের নকশালবাড়ি আন্দোলনের পরই মাওপন্থী কমিউনিস্ট 'গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা'র লড়াইয়ে সংবদ্ধ হয়। জোতদার চিহ্নিতকরণ তাদের পক্ষে সহজসাধ্য হলেও, এমনকি শ্রেণিশত্রু খতম করার সুযোগ পেলেও আশানুরূপ গণমুক্তি ফৌজ গঠন করে বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তারা সক্ষম হয়নি।

ফরিদপুরে যুগীর বিলে তাদের ঘাঁটি ছিল, ঘাঁটিগুলি ছিল দুর্ভেদ্য। কখনো কখনো রাজাকারদের দেখানো পথে পশ্চিমী হানাদাররা এই ঘাঁটিগুলোতে আক্রমণ চালাত। গেরিলা যুদ্ধের নৃশংসতা বিষয়ে লেখকের মন্তব্য—

“মরণপণ গেরিলা যুদ্ধে বীরত্বের নৃশংসতা সমার্থক হয়ে যায়। কখনো কখনো নৃশংসতা বীরত্ব অপেক্ষা বড় গুণ হিসেবে পরিগণিত হয়।”<sup>১০</sup>

২৫শে মার্চের আগে থেকেই এই আক্রমণ হতে শুরু করেছিল। কিন্তু বাটিকা আক্রমণের নৃশংসতা ছিল ভয়াবহ যা মানুষের মানসিকতাকে বিকৃত করার জন্য ছিল যথেষ্ট। ঔপন্যাসিক এই আক্রমণের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে—

“নির্বিচার গণহত্যা। পরের দিন রাতে যাদের হত্যা করা হয়েছে আগের দিন ছড়ানো ছিটানো লাশ ও কবন্ধ তাদের গোর দিতে হয়েছিল। ভীত আতঙ্কগ্রস্ত, ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠা সেনারা নির্বিচারে রাইফেল ও সাবমেশিনগান থেকে গুলি করে মেরেছে। যেই তাদের সামনে পড়েছে ধর্ষণ করেছে বীর্যপাত ছাড়াই, আতঙ্ক তাদের এমন দিশেহারা করছিল।”<sup>১১</sup>

মুক্তিযুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদাররা 'জিহাদের মাল' হিসেবে নারীদের ওপর ব্যাপক আকারে ধর্ষণ চালায়। গোলাম মুরশিদদের কথায় বলা যায় কিশোরী, যুবতী, মধ্যবয়সী কোনো নারীই পাকিস্তানীদের থাবা থেকে রক্ষা পায়নি। কিশোরীদের যোনিপথ ছোটো থাকায় বেয়োনোট দিয়ে কেটে বড় করে নিয়ে ধর্ষণ করার ঘটনাও জানা যায়। সেনাদের দুর্গম ডেরায় নৃশংসতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। কিশোর কিশোরীদের দিয়ে রাজাকার প্রভৃতি খানদের ধরে এনে বেয়োনোট চার্জ করা হতো। তাছাড়া তাদের দলে অনেক হিন্দু ছিল যাদের মধ্যে ধর্ষকাম মনোবৃত্তি ছিল। ঔপন্যাসিক বলেছেন—

“জীবন ছিল অসম্ভব কষ্টকর, ঘৃণ্য। অনিশ্চিত বাঁচা মরা। কমিউনের নামে বাধাহীন যৌনতা ধর্ষণের থেকে মনের মধ্যে বেশি আত্মগ্লানির জন্ম দেয়। হেনা সেখান থেকে অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে পালিয়ে দিনাজপুর আসে মার্চ মাসে। আর তার হারাবার কিছু ছিল না।”<sup>১২</sup>

এই মানসিক আঘাতকে হেনা আজীবন ভুলতে পারেনি। অত্যন্ত গ্রাম্য পদ্ধতিতে তার গর্ভপাত করা হয়েছিল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সে মেনে নিতে পারেনি। সেই তীব্রতা তাকে মৃগী রোগীতে পরিণত করেছিল। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন হেনার ধর্ষিত জীবন একদিকে আত্মগ্লানি বোধ ও অন্যদিকে যৌন আকর্ষণ বোধ বাড়িয়ে তুলেছিল। অবশেষে প্রচণ্ড যুদ্ধ ও গোলাবর্ষণের আওয়াজের মধ্যেই হয়তো বা আওয়াজ থেকে রেহাই পেতে হেনা সরোজের কাছে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে। অবশেষে মৃত্যু তার মানসিক চাপ থেকে চিরমুক্তি দিল।

উপন্যাসে সরোজের অজ্ঞাতবাস জীবন বৃত্তের মধ্যে এসে পড়ে পূর্বপাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা একটি মুসলিম পরিবার। সচেতন পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন কেবল হিন্দুরা নয় মুক্তিযুদ্ধের আবর্তে বিধবস্ত হয়েছিল বহু মুসলিম পরিবার। ধর্ষণের হাত থেকে ধর্ম তাদের রক্ষা করতে পারেনি। শুধু হিন্দু মুসলমান নয়, হিন্দি বা উর্দুভাষী পাকিস্তানীদের একটা অংশ এই যুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছে। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রতিবাদী মুখ রোজী পারভেজ, যে ইউভার্সিটিতে তুখোড় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল তাকেও হতে

## OPEN EYES

হয়েছে ধর্ষিতা, গৃহহীন ও উদ্বাস্ত। আসলে যুদ্ধ সবসময়ই হিংসাত্মক পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

এই হিংসাত্মক পরিণতি মানুষের মনে যে আঘাত সৃষ্টি করে সেই আঘাত থেকে আজীবন সে মুক্তি পায় না। হেনার মতো, রোজির মতো অসংখ্য নারী দেশত্যাগের ট্রমাকে সঙ্গে নিয়ে আজীবন যন্ত্রণার অগ্নিতে পুড়ে মরেছে। রেহাই মেলেনি অভিজিৎ সেন-এর আর একটি উপন্যাস ‘নক্ষত্র নদী ও নারী’র কাঞ্চনমালারও। রাজশাহী জেলা পদ্মা তীরবর্তী কোজাগর গ্রামের বাসিন্দা কাঞ্চনমালা ছিল ১৩-১৪ বছরের কুমারী। বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার। ১৯৬৯ সালে বন্যা, ছাত্র আন্দোলন, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং সন্ত্রাস পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে তছনছ করে দিয়েছিল। বাঙালি মুসলমান তথা পশ্চিম পাকিস্তানীদের একটা বড় অংশের ধারণা ছিল কেবল গায়ের জোরেই তারা বাঙালিদের মুখ বন্ধ করতে সচেষ্ট হবে। এই সকল পাকিস্তানীদের দালাল হয়ে কাজ করত রাজাকার-আল বদরদের দলের লোকেরা। ৭০-এর গোড়ার দিকে কোজাগর গ্রামে এই সকল পাকিস্তানী বাহিনীর আনাগোনা শুরু হয়। এই বাহিনীর কাজে সাহায্য করেছিল পাকিস্তানপন্থী কিছু মানুষ। স্পিডবোট, সশস্ত্র সৈনিকের বন্দোবস্ত চলতে থাকে কোজাগর গ্রামে। গ্রামের কিংবদন্তি মণিভূষণ দত্তের বাড়িকে কেন্দ্র করে, যার গৃহে স্বয়ং পদ্মলক্ষ্মী অচঞ্চলে অবস্থান করেন সেই মণিভূষণ দত্তের বাড়িতে রাজাকাররা লুণ্ঠতরাজ চালায়। ধর্ষিত হয় পরিবারের মেয়েরা। মণিভূষণের ছেলে ফণীভূষণকে আটক করে নিয়ে যায় এবং পরদিন গুলি করে হত্যা করে রাজাকারেরা—

“একদিন রাজাকাররা এসে দত্ত বাড়িতে চড়াও হয়ে লুণ্ঠ করেছেন। মণিভূষণ দত্তের ছেলে ফণীভূষণ দত্তকে পিছমোড়া করে বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে গেছে, তারপর বাড়িঘর লুণ্ঠ করেছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, যা খুশি তাই করেছে। মণিভূষণের ছেলে ফণীভূষণ বাবু কোনরকমে নদীর ঘাট থেকে একটা লঞ্চ করে পদ্মায় ভেসে কোন দিকে চলে গেল।”<sup>১২</sup>

১৯৭০ সালের নভেম্বরে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে পঞ্চাশ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি হয় কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের এ বিষয়ে অনীহা বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে ক্ষোভের জন্ম দেয়। বলা ভালো, তাদের স্বাধীনতা স্পৃহা এইরূপ বিভিন্ন ঘটনায় বাড়তে থাকে। এর প্রভাব পড়েছিল ডিসেম্বরের নির্বাচনে। পূর্বপাকিস্তানে ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করেছিল শেখ মুজিবের আওয়ামী লিগ। বাঙালিদের স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্য এই লিগ অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়েছে। রাজনৈতিক চাপানউতোর দিন দিন বাড়তে থাকলে তৎকালীন সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ইয়াহিয়া খান পূর্বপাকিস্তানীদের হত্যার পরিকল্পনা করে। বেলুচিস্তানের ‘কসাই’ উপাধিধারী টিকার নেতৃত্বে ২৫শে মার্চ রাটিকা আক্রমণ হয় পূর্বপাকিস্তানে। এই আক্রমণে ত্রিশ লক্ষ লোকের মৃত্যু ও শিশুদের উপর অত্যাচার সংঘটিত হয়—

“বাংলাদেশের ওপরে যে বাহুবিচারহীন হত্যা ও ধ্বংস সংঘটিত হয়েছিল, তার সঙ্গে একমাত্র হিটলারের হত্যা ক্যাম্পের তুলনা করা যায়। .... বাদীদের হত্যার একটা লক্ষ্য থাকে যা ক্ষতিকর হলেও কোনও একটা উদ্দেশ্য থাকে। .... কিন্তু পাকিস্তানীদের এই নির্বিচার হত্যা ধর্ষণ অগ্নিসংযোগের পিছনে একরকম কোনও হেতু কেউ খুঁজে পাবে না। মানবিকতা ব্যাপারটাকেই খুনিরা যেন ভণ্ডামি বা অস্তিত্বহীন একটা বৃথা বাগাড়ম্বর বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন।”<sup>১৩</sup>

বেঁচে থাকার তাগিদ নিয়ে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ছুটেছে ভারত সীমান্তের দিকে। এই ছুটে চলা পনেরো-কুড়ি দিনেও শেষ হয় না। হাঁটপথে, কখনও বোপে জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে, ধানের জমির মধ্যে শুয়ে, বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে, জলে ডুব দিয়ে কেবলমাত্র অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে ছুটে চলেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। কাঞ্চনমালা এইরকম একটি দলের সঙ্গে সীমান্তের উদ্দেশ্যে ছুটেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানী হানাদারদের হাতে পড়ে অসংখ্য নারী হারিয়েছিল তাদের কৌমার্য। সকল বয়সী নারীদের ওপর নির্মম ভাবে অত্যাচার করা হয়েছিল। একাধিকবার ধর্ষণের শিকার



হতে হয়েছিল তাদের। ধর্ষণের ব্যাপারে পাকিস্তানী সৈন্যরা বিশেষ উৎসাহী ছিল। বিশেষ করে কুমারী নারীদের প্রতি তাদের আগ্রহ ছিল বেশি।<sup>১০</sup> রাজাকাররা অত্যাচারের পর সুন্দরী মেয়েদের দারোগার কাছে পাঠাত উপহার হিসাবে। এরই অন্য চিত্র পাওয়া যায় মহাশ্বেতা দেবীর ‘দ্রৌপদী’ গল্পে — “ওকে বানিয়ে নিয়ে এস। ডু দি নীডফুল।”<sup>১১</sup> বানিয়ে আনার এই দৃশ্যে প্রাণ শিহরিত হয়ে ওঠে।

‘নক্ষত্র নদী ও নারী’ উপন্যাসে দেখি ধর্ষণের আগে কাঞ্চনমালার রূপে মুগ্ধ হয়ে সবির তালুকদার তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। খাসি কাটার আগে ছাগল পরিচর্যার মতোই যেন সবির তালুকদার পরিচর্যার মোড়কে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছে কাঞ্চনমালাকে। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য, বাবার বয়সি এক পাষাণের হাত থেকে পালাতে চেয়েছিল কাঞ্চনমালা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। জগ ছুঁড়ে মেরেও নিজেকে বাঁচাতে পারেনি কাঞ্চনমালা। গোলাম মুরশিদের বই থেকে জানতে পারা যায় গণধর্ষণের পর বেয়োনেট দিয়ে যোনিপথ কেটে হত্যা করা, স্তন কেটে ফেলা, ধর্ষণ করে মেরে ফেলা, অর্ধমৃত অবস্থায় রাস্তায় ফেলে রাখা, এমন কোনও অত্যাচারের কথা ভাবা যায় না যার আশ্রয় নেয়নি পাকসেনারা। যুদ্ধশেষে যেসব মহিলা একাধিকবার ধর্ষিত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন তাদের কাছ থেকে উঠে আসে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য। তাই লেখক যখন কাঞ্চনমালার কথা বলেন তখন আমরা বিস্মিত হই, শিহরিত হই; এক তীব্র অমানবিক অত্যাচারের ছবি যেন জ্বলন্ত হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে—

“মোট কতবার তাকে ধর্ষণ করা হয়েছে সে জানেনা। দ্বিতীয়বারের পর তার মনে হয়েছিল তার ভিতরের সবকিছু বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং সে জ্ঞানহারী হয়ে পড়েছিল। তার অনেক সময় পরে তার আর একবার জ্ঞান ফিরে এসেছিল কিছু সময়ের জন্য। তখন সে টের পেয়েছিল তখনও একজন মানুষ তার শরীরের উপরে কসরত করে যাচ্ছে।”<sup>১২</sup>

মালদা হাসপাতালে ন’দিন থাকতে হয়েছিল কাঞ্চনমালাকে। কাঞ্চনমালার মা সুখীবালাও ধর্ষিত হয়েছিলেন। মালদায় এক ভাইয়ের দাওয়াই ঠাই পেয়েছিলেন সুখীবালা মেয়েকে নিয়ে। শিক্ষার সুবাদে সুখীবালা অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিদিমণি হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। ফলে একটি ভাড়াবাড়িতে মেয়েকে নিয়ে শুরু হয় সংসার জীবন। অভিভাবকহীন পরিবারের সুখীবালা কাঞ্চনমালাকে অসম্ভব প্রতিভাবান ভুবন ঘোষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে ভুবন ঘোষের মতো সুপাত্র দুর্লভ বটে। ফুটবল খেলায় ভুবনের জুড়ি মেলা ভার, আর বড় দলে সুযোগ পেলে তার রোজগারও ভালো হবে। কিন্তু কাঞ্চনমালার সঙ্গে ভুবন ঘোষের দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি। বরং অসংখ্য ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত কাঞ্চনমালাকে হতাশা ও বিষণ্ণ করে তুলেছিল, এমনকি শেষাবধি মানসিক আঘাত তাকে বিপন্ন ও নিঃশব্দ করে তোলে। বহু ঘটনার সাক্ষী কাঞ্চনমালা জীবনভর বেঁচে থাকার জন্য অনবরত সংগ্রাম চালিয়েছে। অভিভাবকহীন জীবনে অসম্ভব সুন্দরী কাঞ্চনমালাকে নারী জীবনের মাশুল দিতে হয়েছে বারংবার। কিন্তু কাঞ্চনমালার মধ্যে ছিল অগ্নির তেজ। ভুবন ঘোষ সবসময় বাড়িতে থাকতেন না খেলার সুবাদে। হলিদায় ভুবন ঘোষের বাড়িতে বহু রাত কাঞ্চনমালা নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছে। পরিবারের সদস্য বলতে ছিলেন কেবল সাঁওতাল বান্দেনা এবং শয্যাশায়ী দিদি শাশুড়িমা।

ভুবন ঘোষ কখনোই কাঞ্চনমালার প্রতি স্বামীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। স্বাভাবিকভাবেই ভুবন ঘোষের অনুপস্থিতিতে কাঞ্চনমালার জীবনে পরিবর্তন আসে। আবির্ভাব ঘটে ব্যাক্তের সুপারভাইজার অমৃত মজুমদারের। ভুবন ঘোষের সূত্রে অমৃতের এই বাড়িতে আসা যাওয়া শুরু হয়েছিল, ঋণের টাকা আদায় তার অন্যতম কারণ। কাঞ্চনমালার সঙ্গে অমৃতের ঘনিষ্ঠতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু পরপরুষের সঙ্গে সখ্যতা গ্রামের মানুষ মেনে নেয়নি। তাই অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাক্ত থেকে সাসপেণ্ড হয় অমৃত। আসলে অমৃত হয়ে উঠেছিল কাঞ্চনমালার অঘোষিত অভিভাবক। কাঞ্চনমালাকে ভোগ করার বাসনা ছিল অনেকেরই। তাই অমৃতের সাসপেণ্ড হওয়ার পর ব্যাক্তের আর একজন সুপারভাইজার মহিপদর পথের কাঁটা দূর হয়। টাকা আদায়ের অজুহাতে মহিপদ কাঞ্চনমালার

## OPEN EYES

কাছে আসা যাওয়া শুরু করে। কাঞ্চনমালাকে ভোগ করার তীব্র লালসা ছিল তার। বাড়িতে এসে অশালীন তীর্যক মন্তব্য করত মহিষদ। কিন্তু মহিষদ আদৌ কোনদিন সুযোগ পায়নি, সেই সুযোগ দেয়নি বান্দেনার হেঁসোখানা; যা দেখে শুনে মহিষদের গলার জল শুকিয়ে এসেছিল। বলাবাহুল্য এই হেঁসোর সামনে নিজের গলার কথা চিন্তা করে মহিষদের বুক কেঁপে উঠেছিল। রক্ষা পায়নি ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ী রাখানাথ সাটিয়ারও।

কলিকে পড়াশোনা শেখানোর আশায় এবং পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য কাঞ্চনমালা মেয়ে কলিকে মালদায় মায়ের কাছে পাঠালেও শেষ রক্ষা হয়নি। সঙ্গদোষে কলি তার কৌমার্য হারিয়েছিল ১৪-১৫ বছর বয়সেই। এমনকি ড্রাগের নেশাও ছিল তার। থানায় ধরে নিয়ে যাওয়ার পর দারোগার কথা শুনে সুখীবালা কলিকে বাড়ি এনে মারধর করে মায়ের কাছে হালিদায় পাঠিয়ে দেয়। রাখানাথ সাটিয়ার ছিলেন হালিদার একজন ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ী। বাজে নেশা ও নারী ভোগে তার তীব্র আসক্তি। অর্থের বিনিময়ে বালিকা তথা কিশোরীদের ভোগ করার প্রবণতা ও নেশাও ছিল রাখানাথের। দোকানে জামা কাপড় কিনতে আসা মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে আশ্চর্য এক সুখ অনুভব করত সে। রাখানাথের স্ত্রী সাবিত্রী কাঞ্চনমালার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল। তাকে ডেকে এনে ধান বাড়ার সময় কাজ দিয়েছিল সাবিত্রী। কিন্তু হালিদায় কলি এলে রাখানাথের চোখ এড়াতে পারেনি। কলির গায়ে হাত বুলিয়ে রাখানাথ আশ্চর্য রকমের সুখ পেয়েছিল। এই রাখানাথকে কাঞ্চনমালা খুন করে। কিন্তু কেন কাঞ্চনমালা খুন করেছিল তার কোনো স্পষ্ট জবাব সে পুলিশকে দিতে পারেনি। সে নিজেই জানত না এর প্রকৃত উত্তর। লেখক স্পষ্ট করে বলেননি কিন্তু অনুমান করা যায় এই খুনের পেছনে রয়েছে কলির ওপর রাখানাথের আসক্তি। হয়তো কলিকে রাখানাথ ভোগও করেছে।

ধর্ষিত নারীর চোখে ধর্ষকের জন্য যে অগ্নিকুণ্ড গড়ে ওঠে শত চন্দনের প্রলেপও তাকে শীতল করতে পারে না। কাঞ্চনমালা স্বামীর সংসারে সুখ পায়নি, অমৃতকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। কলিকেও গ্রহণ করতে চেয়েছিল অমৃত। ভুবনের কোন সংবাদ না পাওয়ায় এবং আইনি সমস্যার সমাধান হেতু তারা ঠিক করেছিল দু এক বছরের মধ্যেই সব ঠিক করে বিবাহ করবে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অমৃতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করতে না পারায় এবং অমৃতের বিবাহের ভুল সংবাদ শুনে কাঞ্চনমালা স্বাভাবিকভাবেই ব্যথিত হয়েছিল। তিন মাস পর সেণ্ট্রাল জেলে কাঞ্চনমালা বদলি হলে বহরমপুর যাওয়ার পথে অযোধ্যা প্রসাদ নামে এক রক্ষীকেও খুন করে কাঞ্চনমালা। রক্ষীটি চায়ের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল, যা কাঞ্চনমালা সম্পূর্ণটা না খেয়ে ফেলে দেয়। জেলখানার রক্ষীদের ওপর অযোধ্যা প্রসাদের কর্তৃত্ব ছিল। ঘুমের ঘোরে কাঞ্চনমালা টের পেয়েছিল অযোধ্যা প্রসাদ ধর্ষণের সূচনা করছে। এরকম কাজ অযোধ্যা প্রসাদ আগেও করেছে কিন্তু খুনের আসামীদের কাছ থেকে কোনো প্রতিরোধ আসেনি বলে তা তার কল্পনাতেও ছিল না। লোহার শিকের গরাদে কাঞ্চনমালা অযোধ্যা সিংয়ের মাথা ঠুকে মেরেছিল বার চারেক। এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি।

আসলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কাঞ্চনমালার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল তার ভিটেমাটি, সে হারিয়েছিল তার বাবাকে, হারিয়েছিল নিজের কৌমার্য। দেশভাগের ট্রমা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করেছিল যা থেকে আজীবন রেহাই মেলেনি কাঞ্চনমালার। অসহায়তা, রাগ, ভয়, মূল্যহীনতার অনুভূতিতে আজীবন দন্ধ হয়েছে ‘ধর্ষিত’রা। তাই জেলে বসে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কাঞ্চনমালার মনে পড়েছিল—

“... সাবির তালুকদারের প্রথমবারের উন্মত্ত প্রবেশের অনুভূতি। মনে পড়েছে এই চব্বিশ বছর পরেও তার কোমর থেকে পায়ের আঙুল পর্যন্ত যন্ত্রণায় যেন অসার হয়ে গেল। একটু অস্ফুটকাতর শব্দও গলা থেকে তার বের হল।”<sup>২৭</sup>

এই যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে বেঁচে আছে অসংখ্য কাঞ্চনমালা, যারা জানে সতীত্ব আর বেশ্যা একই অচল পয়সার দুপিঠ। জীবন তাকে বুঝিয়েছে একটা পাওয়া যায় সুখের বিনিময়ে আর অপরটি পাওয়া যায় অর্থের বিনিময়ে। মা-

বাপের স্নেহ না পাওয়া মেয়েটা হলিদায় আসার আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। রাখানাথ সাটিয়ার তাকে ভোগ করেছে মাত্র কিন্তু সে ই প্রথম নয়। আসলে ধর্ষকের যে চিত্র কাঞ্চনমালার মনে গেঁথে আছে তা থেকে মুক্তি পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই রক্তের উৎসব করতে সে ভয় পায় না। মানসিকভাবে বিশ্বস্ত কাঞ্চনমালা হতাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল যেখান থেকে ফিরে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয় তাই খুন হওয়া অবশ্যস্বাভাবী ছিল।

ধর্ষিত মেয়েদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ এক চরম অভিশাপ। অত্যাচারের স্মৃতি সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া ছিল বেঁচে থাকার জন্য অতি আবশ্যিক। যে আকস্মিক মানসিক আঘাত অবচেতন মনে দীর্ঘদিন লালিত হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসা দুষ্কর ছিল প্রতিটি মেয়ের ক্ষেত্রেই। এই আঘাতের যা উপশমের একমাত্র ঔষধ ছিল স্নেহ ভালোবাসা ও আন্তরিকতা। হতভাগী কাঞ্চনমালার জীবনে এই স্নেহ ভালোবাসা সুরক্ষা কোনও দিন স্থায়ী হয়নি। ভাগ্যের পরিহাসে, সামাজিকতা রক্ষার দাবিতে, অমৃত র ভালোবাসা কাঞ্চনমালাকে সুরক্ষিত রাখতে পারেনি। মেয়ে কলিকতেও ধর্ষকের ধারালো দাঁত নখের আঁচড় থেকে বাঁচাতে পারেনি মা কাঞ্চনমালা। নিজের জীবনের ব্যর্থতা, হতাশা, গ্লানি কাঞ্চনমালার অবচেতন মনের প্রতিশোধস্বপ্ন বাড়িয়ে তুলেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরিণাম স্বরূপ এই যন্ত্রণা, ভয়াবহ বেদনা বহন করে চলেছে অসংখ্য কাঞ্চনমালা। ‘নক্ষত্র নদী ও নারী’ উপন্যাসটি এইরকম একজন কাঞ্চনমালার বেদনার রক্তে রঞ্জিত।

সর্বোপরি, দেশভাগ, মুক্তিযুদ্ধ, সমকালীন রাজনীতি সে সময়কার যুবক যুবতীদের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। অস্তিত্বের লড়াইয়ে জীবন তাদের বিপন্নপ্রায়। জীবনের অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও যুদ্ধের স্মৃতি, রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা, তীব্র অমানবিক অত্যাচার থেকে তাদের মুক্তি মেলেনি। ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ প্রেম আর বহুবিধ ভ্রান্তি বেঁচে থাকার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে। সরোজের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যন্ত্রণার আঁচ আমরাও পাই। হেনার জীবনে অমানবিক ধর্ষণ, না পাওয়ার তীব্র বেদনা, রোগের ভয়াবহতা, জীবনের অস্তিম পরিণতি ধর্ষণের নতুন পাঠ শেখায়। পাশাপাশি রুমেলা, সতী কিংবা আব্দুল কুদ্দুসের অসহায় জীবন এই সত্য উদ্ঘাটন করে যে, যুদ্ধের, দাঙ্গার, রাজনীতির কোনো জ্ঞাত থাকে না। অন্যদিকে যুদ্ধকালীন সময়ে কাঞ্চনমালার সব হারানোর বেদনার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তীব্র মানসিক আঘাত। দেশত্যাগের সময়কার এই ট্রমাকে কাঞ্চনমালার মতো অসংখ্য নারী ভুলতে পারেনি। অসহায়তা, মূল্যহীনতার যে বীজ হৃদয়ের অন্তরালে সুপ্ত ছিল তার প্রকাশ যে কী মারাত্মক ও ভয়াবহ হতে পারে কাঞ্চনমালা তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বদেশকে হারিয়ে স্বদেশের খোঁজে আসা মানুষগুলির কাছে দেশভাগ মুক্তিযুদ্ধের পরিণতি যে কতটা ভয়াবহ তা তুল্যমূল্য নির্ধারণ এই সময় দাঁড়িয়ে বোঝা একপ্রকার অসম্ভব।

#### তথ্যসূত্র

১. অভিজিৎ সেন, ‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ৭৭।
২. তদেব, পৃ. ২৩।
৩. তদেব, পৃ. ১২৫।
৪. তদেব, পৃ. ৫৪।
৫. তদেব, পৃ. ৩২।
৬. তদেব, পৃ. ১২৫।
৭. জয়দীপ ঘোষ, ‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা : হাইরাজের আখ্যান’, জনপদপ্রয়াস (বইমেলা, জানুয়ারি, ২০০৬, বিকাশশীল (সম্পা.), অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, মাঘ ১৪১২, পৃ. ৭৫।
৮. অভিজিৎ সেন, ‘স্বপ্ন ও অন্যান্য নীলিমা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃ. ২১।
৯. তদেব, পৃ. ৫৪।
১০. তদেব, পৃ. ৫৭।

## OPEN EYES

১০. তদেব, পৃ. ১০৮।
১১. অভিজিৎ সেন, 'নক্ষত্র নদী ও নারী', স্বস্তিক প্রকাশন, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৫, পৃ. ১৩৭।
১২. তদেব, পৃ. ১৩১-১৩২।
১৩. গোলাম মুরশিদ, 'মুক্তিযুদ্ধ তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস', প্রথমা প্রকাশন, বাংলাদেশ, ঢাকা ১২১৫, পৃ. ৮৩।
১৪. মহাশ্বেতা দেবী, দ্রৌপদী, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, পৃ. ৩৮।
১৫. অভিজিৎ সেন, 'নক্ষত্র নদী ও নারী', পৃ. ১৪৬।
১৬. তদেব, পৃ. ১৪৪।

---

টুম্পা দাস  
গবেষক, বাংলা বিভাগ,  
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

## ছোটগল্পে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বয়ান অভিষেক প্রামাণিক

বাংলাদেশের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন এক অধিকার অর্জনের লড়াই। ‘পরাধীন পূর্ব পাকিস্তান’কে বাংলাদেশে পরিণত করার পথের সূত্র ভাষা আন্দোলন। শুধু রাজনীতি নয় এই আন্দোলনের সঙ্গে জুড়ে যায় সংস্কৃতি, সাহিত্য। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্ব থেকে শুরু হয়ে, ১৪ই আগস্টের স্বাধীনতা যখন শুধুমাত্র ‘স্বাধীনতা’ এই শব্দবন্ধেই শেষ হয়ে যায়, তখন সেই রাষ্ট্রকে আপন পরিচয় সম্বন্ধে আবারও ব্রতী হতে হয়। বাংলা ভাষা আন্দোলন সেই ব্রতের নাম, যা ১৯৪৮ থেকে শুরু হয়ে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে অমর করেছে আর পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলাদেশে মুক্তির পথের সম্মান দিয়েছে। ভাষার অধিকারের প্রশ্ন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে শিখিয়েছে। সেই ঐক্যের মৌনতা থেকে ব্যক্ততার অধিকার অর্জনের লড়াইয়ের ইতিহাস বাংলাদেশের সাহিত্যে বারবার নিজের অস্তিত্বকে সমাহিমায় জানান দিয়েছে।

“একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তমাখা আবেগ সাহিত্য অঙ্গনের সবকিছু তছনছ করে দিয়েছিল। তীব্র জ্বালাময় অভিব্যক্তি নিয়ে কবিতাই প্রথম একুশের পতাকা কাঁধে তুলে নিয়েছে।”<sup>১</sup>

তবে শুধু কবিতা নয়, ছোটগল্পেও উঠে এসেছে মাতৃভাষা আন্দোলনের তীব্র প্রতিবাদের স্বর, তার প্রেক্ষিত, ইতিহাস।

১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেলে, পাকিস্তান তার সমগ্র রাষ্ট্র অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বলবত করতে চেয়েছিল। নব্যগঠিত দেশে এই কর্ম স্বাভাবিক সম্পাদনার মধ্যে পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে ভিন্ন দিক থেকে, উর্দুকে মাতৃভাষা হিসেবে ভালোবেসে তাঁরা রাষ্ট্রভাষা করতে চাননি। বরং সে কৌশলে লুকিয়ে ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের স্বার্থ। ইতিহাস থেকে আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারি, শুধুমাত্র বাহুবলের দ্বারা শাসনের শিকলকে অক্ষত রাখা যায় না। তার সঙ্গে শাসিত মানুষের ওপর শাসক ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবান্বিত এক নিয়ন্ত্রক জাল রচনা করে। যার উদ্দেশ্য হল শাসকের ভাষায় রচিত সাহিত্য, তাদের লালিত সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দর্শন, ইতিহাসের প্রতি শাসিতজনের মনে সন্ত্রস্ত ও শ্রদ্ধার ভাব জাগানো। ইংরেজ শাসনের দিকে লক্ষ্য করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয়, সমগ্র পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও পাঞ্জাবের জমিদারেরা শাসনক্ষমতা লাভ করেছিল এবং তাদের ভাষা ছিল উর্দু। ফলে শুধুমাত্র ক্ষমতার কেন্দ্রকে ভর করে উচ্চপদস্থের মাতৃভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দিকে এগিয়ে গেল। উর্দুভাষী কর্মকর্তাদের প্রভাবে কায়দে আজম জিন্নাহ নিজে গুজরাটিভাষী হয়েও উর্দুর পক্ষে রায় দিলেন। ফলে যে সকল বাঙালি নেতারা অনুগ্রহ প্রার্থী ছিলেন তাঁরাও উর্দুভাষার পক্ষেই সওয়াল করলেন, শুধুমাত্র ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করার সুযোগ পাওয়ার জন্য। কিন্তু এই উর্দুবৃত্তের মধ্যে প্রবেশ করলেন না ছাত্রসমাজ, সাহিত্যিক ও তরুণ বুদ্ধিজীবীরা।

১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে মাউন্টব্যাটেন ভারত ভাগের পরিকল্পনার ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যেই জনমানসে প্রচারিত হয়ে যায় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ঘোষণার পরও বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল কলকাতা। সেখানেই চলত ভবিষ্যতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা। সেক্ষেত্রে আলোচনার একটি প্রধান বিষয়বস্তু ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন। প্রথমে কলকাতাতেই এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার চেষ্টা দেখা দেয়। পাকিস্তান গঠনের অনেক আগে থেকেই বাংলা ভাষাকে অখণ্ড ভারতে জাতীয়

---

প্রামাণিক, অভিষেক : ছোটগল্পে বাংলা ভাষা আন্দোলনের বয়ান

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 1, June 2022, Page : 31-36, ISSN 2249-4332

## OPEN EYES

পর্যায়ে স্বীকৃতি দানের প্রস্তাব ওঠে। ১৯১১ সালে রংপুর প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে সৈয়দ নওয়াব আলী ভারতের অন্যতম ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতির কথা বলেন এবং বিশ্বভারতীর এক সম্মেলনে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভারতের সাধারণ ভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না পাকিস্তান গঠনের আগে বা মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা ঘোষণার অনেক আগে থেকেই বাংলাভাষার মর্যাদা নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহল সচেতন ছিলেন। তবে এটা ঠিক ইংরেজ আমলে এদেশীয় মানুষের ভাষাকে কেড়ে নিতে চাওয়া হয়নি। সে চেষ্টা দেখা গেল পাকিস্তান আমলে। ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে যেমন চাকরির জন্য ইংরেজির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেই কৌশলকেই পশ্চিম পাকিস্তান ব্যবহার করতে চেয়েছিল। উর্দু না শিখলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সরকারি কর্মী হতে পারবে না, সেকথা জানানো হয়। একদিকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগ অন্যদিকে কূটনৈতিক কৌশল—এই দুইকেই অবলম্বন করে পশ্চিম পাকিস্তান তার চক্রান্তের বুনন তৈরি করেছে। বাঙালির উন্নত ভাষা চেতনা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐক্যের জন্যই পাকিস্তানের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধতে পেরেছিল। আর সব থেকে বড় হয়ে উঠেছিল এই প্রশ্ন যে, পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হলেও কেন সেই ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হবে না?

একটা বিষয় স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের ভাষাকে সংখ্যা গরিষ্ঠের ওপর আরোপ করতে চাওয়া হয়েছিল। আর এই বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস রক্তক্ষয়ী দিনের অভিযাত্রাও বটে, ছোটগল্পে যার অমরত্বের প্রকাশ ঘটেছে। ভাষার প্রশ্ন আসলে পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই। ১৯৪৭ সালের ১৭ই মে হায়দ্রাবাদে নিখিল ভারত মুসলিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য চৌধুরী খালিকুজ্জামান এবং জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াসউদ্দিন আহমেদ বলেন, উর্দু পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।<sup>১</sup> কলকাতার দৈনিক ‘ইত্তেফাক’, ‘দৈনিক আজাদ’, সাপ্তাহিক ‘মিল্লাত’ ইত্যাদি পত্রিকায় জুন-জুলাই মাসেই আব্দুল হক, মাহবুব জামাল জাহেদী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ বাংলা ভাষার দাবী তুলতে শুরু করেন।<sup>২</sup> আবার ১৯৪৭ সালেরই ১৫ই নভেম্বর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সার্কুলার পাঠায় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ৩১টি বিষয়ের পরীক্ষা ৯টি ভাষায় দেওয়া যাবে। কিন্তু সেখানে বাংলা ভাষার উল্লেখ ছিল না।<sup>৩</sup> খুব স্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায় বাঙালি ছাত্রদের প্রতি এই সার্কুলার ছিল এক অপমান ও ভাষার অধিকার হরণকারী পদক্ষেপ। ‘ছাত্ররা’ হ্যাঁ ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। তাদের অধিকার অর্জনের লড়াই সাহিত্যেও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। নির্বাচিত দুটি ছোটগল্পেও ছাত্রদের ভূমিকা জোরালো ভাবেই সোচ্চার হয়েছে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন হলেও ভাষা আন্দোলনের মূলগতি স্লথ বা বলা চলে স্থগিত হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ২৬শে জানুয়ারি ১৯৫২ সালে ঢাকা শহরে আসেন এবং ২৭শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা করেন—“উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা”।<sup>৪</sup> প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের স্ফুলিঙ্গটুকুই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের দাবানল সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ভাষার দাবিকে দমন করার কৌশলই আন্দোলনের ভিত্তিভূমি নির্মাণ করেছিল। নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার পর যখন ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করে তখন সরাসরি প্রস্তুত হয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভিত্তিভূমি। ঐ দিনই বিকেলে ডিস্ট্রিক্ট বার লাইব্রেরি হলে আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সর্বদলীয় সম্মেলন এবং সিদ্ধান্ত হয় ২১শে ফেব্রুয়ারি সভা, মিছিল ও হরতাল পালনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি হরতাল এবং ১১ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি ঢাকার সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পতাকা দিবস পালন করা হয়। এই কর্মসূচি সফল হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই সাফল্য শাসককে

বিভ্রান্ত করেছিল। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারিকে বানচাল করার জন্য পাকিস্তান সরকার শেষ কৌশল অবলম্বন করে ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ছ’টায় ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।<sup>১</sup> তারই পরের দিন ইতিহাসের পাতায় আজ স্বর্ণাঙ্করে লিখিত। কিন্তু তার পিছনে ছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে ২১শে ফেব্রুয়ারি। ঐ দিনের রক্তক্ষয়ের ইতিবৃত্ত গল্পের আঙ্গিকে ধরা পড়েছে আনিসুজ্জামানের ‘ছুটি’তে। গল্পের চরিত্রদের মধ্যে রয়েছে একজন অবসরপ্রাপ্ত কেরানি সাদত সাহেব, তাঁর পুত্র আসাদ, অন্তঃসত্ত্বা পুত্রবধূ হাসিনা এবং কন্যা সালেহা আর তারই মাঝে ভাষা শহীদের বার্তাবাহক বাচ্চু। গল্পের চরিত্র সালেহা জানায়—

‘সালেহা এল এবার দৌড়ে। বলল, ‘আব্বা কি হয়েছে জান?’

‘কি মা?’

মেডিক্যাল হোস্টেলে রাষ্ট্রভাষা দাবিতে ছাত্রেরা বিক্ষোভ করছিল, পুলিশ গুলী চালিয়েছে।

... ছ’জন মারা গেছে।’<sup>২</sup>

বোঝা যায় গল্পে উঠে এসেছে ২১শে ফেব্রুয়ারির কথা, আবুল বরকতদের শহিদ হওয়ার দিনের কথা। ১৯৫২ র ২১শে ফেব্রুয়ারি বরকত আইন অমান্য করে ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিলে যোগ দেন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের দিক থেকে।<sup>৩</sup> মেডিক্যাল কলেজেই প্রাণ হারাতে হয় আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, আব্দুস সালামদের। গল্পে সাদত সাহেবের মনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসনের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজত্বের তুলনার কথা উঠে আসে। তাঁর ছেলে আসাদের অফিসের স্ট্রাইক। আর সেই স্ট্রাইকের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিবাদে নামলে তাকেও পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাতে হয়। এ যেন ভাষা আন্দোলনের পরোক্ষ শহীদের আখ্যান। তবু বৃদ্ধ সাদত সাহেব আসাদের মৃত্যুর পর তার সন্তানের ভবিষ্যৎ কল্পনায় ভাষাকে বাঁচানোর আশাই খুঁজে পান।

ভাষার অধিকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের পদক্ষেপ ঢাকা শহরে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ছাত্র থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রিক্সাওয়ালার, কেরানি সকলেই প্রতিবাদের ঐক্যে মিলিত হয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে ‘সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ’-এর তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে না।<sup>৪</sup> কিন্তু আন্দোলনে সবথেকে সক্রিয় অংশ ছাত্রেরা সে সিদ্ধান্ত মানল না। ছাত্রেরা ঠিক করে ২১শে ফেব্রুয়ারি ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিখ্যাত ‘আমতলা’য় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সকলে সমবেত হলে ছাত্রনেতা আব্দুস সামাদের একটি প্রস্তাবে ঠিক হয় দশজন দশজন করে বেরিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে যাতে উত্তেজনা কম থাকে।<sup>৫</sup> ছাত্রেরা দশজন করে বেরোতে থাকলে যখন ছাত্রদের গ্রেপ্তার করেও থামানো গেল না তখন শুরু হল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে কাঁদুনে গ্যাসের শেল ফাটানো ও লাঠি চার্জ। আনুমানিক বেলা ৪টের সময় পুলিশ মেডিক্যাল কলেজের সামনে গুলি চালায়।<sup>৬</sup> ভাষার জন্য শহীদ হতে থাকে একের পর এক ছাত্র যুবক। মোট ১১জন শহিদ হয়েছিল বলে জানা গেলেও তার মধ্যে ৮ জনের পরিচয় পাওয়া যায়—আবুল বরকত (১৯২৭-১৯৫২), আব্দুল জব্বার (১৯১৯-১৯৫২), রফিকুদ্দিন আহমেদ (১৯২৬-১৯৫২), আব্দুল আওয়াল (১৯২৬-১৯৫২), অহিউল্লাহ ও একজন অজ্ঞাত পরিচয় বালক।<sup>৭</sup>

সাইয়িদ আতীকুল্লাহ র ‘হাসি’ গল্পেও উঠে আসে ভাষা আন্দোলনের করুণ কাহিনি। আখ্যান নির্মিত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব নিয়ে। ৪ঠা থেকে ২০শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটের জন্য প্রস্তুতি চলেছিল। প্রস্তুতির কর্মী গল্পের চরিত্র আবু। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটকে সফল করার জন্য আবু রাতভোর কাজ করে। আবু ভাষার অধিকারের দাবিতে পোস্টার লেখে, পোস্টার ও কাগজের স্তুপ হয়ে যায়। একুশকে সফল করার জন্য

## OPEN EYES

সেই কাগজের স্ৰুপ থেকে উঠে আসে নানা অগ্নিবর্ষী শ্লোগান—

- “: রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। বাংলা ভাষা জিন্দাবাদ!!  
: ভাষার উপর হামলা চলবে না! ফ্যাসিস্ত নাজিম নিপাত যাও।।  
: ২১শে ফেব্রুয়ারির ডাক : সাড়া দিন।”<sup>১০</sup>

দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ভাষা যোদ্ধার মাথায় থাকেনা কোনও বৃত্তির চিন্তা, থাকে শুধু ভাষা আন্দোলনকে সফল করার আশ্রয় চেষ্টা। তাই আবু পূর্বপরিকল্পিত কাজ সমাপ্ত করতে চায়—

“সাড়ে নটায় যুনিভার্সিটিতে পৌঁছতেই হবে। এগারোটার ভিতরে পোস্টারগুলো স্টেটে শেষ করতে হবে।”<sup>১১</sup>

আবুর মতো ভাষা আন্দোলনকারীদের ছবি গল্পে স্পষ্ট। গল্পে উঠে আসে একুশের ইতিহাস। যেখানে দশজন করে একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে ছাত্ররা মিছিল করে। তীব্র প্রতিবাদে পুলিশ গুলি চালায়—“অব্যর্থ বলেটে একজনের মাথাটাই উড়ে গেছে।”<sup>১২</sup> শাসকের অস্ত্রের সামনে ঐক্যে ফাটল দেখটা দিলেও বিচ্ছিন্নভাবে আওয়াজ ওঠে রাষ্ট্রভাষার অধিকারের দাবিতে। আর সেই দাবির অঙ্গীকারকে বুকে নিয়েই আবুর মতো ছাত্রকে প্রাণ দিতে হয় শাসকের নির্মমতায়। যে মৃত্যু গল্পের অন্য চরিত্র নীহার খালার মতো অনেকের সঙ্গেই সম্পর্কেই ইতি টেনে দেয়। এমনকি ভাষা শহীদের মরদেহ দেখার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় না। মৃত্যুর পরেও শাসকের নিষ্ঠুরতা শেষ হয় না। আর শহীদের আত্মীয়, নীহার খালার মতো মানুষের মনে ধরিয়ে দেয় বিকৃতির স্পষ্ট ছাপ। ভাষা আন্দোলনের পটভূমি প্রামাণিকতার সঙ্গে মানসিক বিপর্যস্ততার দলিল হয়ে ওঠে সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্ র গল্পটি।

এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয়, আতোয়ার রহমানের ‘অগ্নিবাক’ নামের গল্পটির কথা। গল্পে নিজের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার অঙ্গীকার করেছে গল্পের চরিত্র মণি। আর স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় তার বাড়ির মা ও স্ত্রী তাকে আন্দোলনে যেতে দিতে ইচ্ছুক নয়। মণি ও তার বন্ধু ইউসুফ ভাষার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার ভাষাকে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু জানে না। গল্পে ইউসুফকে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের কথা বলতে দেখা যায়। প্রসঙ্গত গল্পে উঠে আসে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষিক আগ্রাসনের কথা—

“উঃ ভাষাটাকে পায়ে ঠেলে ওরা আমাদের সংস্কৃতিটাকেই খুন করতে চায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে অপমান করে কি করে যে দেশের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে বুঝিনে।”<sup>১৩</sup>

সেই সূত্রে মণির কথায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো দাবি ও শপথ শোনা যায়। ঐতিহাসিক পরিসংখ্যানও বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা সমর্থন করে। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার অধিকার অর্জনের লড়াইয়েই ইউসুফ ও মণি রাস্তায় নামে। কিন্তু ইউসুফ ফিরলেও লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মণির আর জীবন্ত ফেরা হয় না। মণিকে গুলিতে প্রাণ দিতে হয়। গল্পে একুশে ফেব্রুয়ারি আর মণির বয়স একুশ এক সমান্তরাল চিত্র অঙ্কন করে। মণির মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে একুশের জয় ঘোষিত হয়। তাই মণির মৃত্যু হলেও ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সঞ্চারিত হয় মাহবুবর গর্ভের সন্তানের মধ্যে। বোবা যায় মণির মতো মানুষের প্রাণ ভাষিক অঙ্গীকারে দৃঢ়তরভাবে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে অধিক সংখ্যক মানুষকে।

ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকারের প্রতিজ্ঞা ও রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারির ইতিহাস উঠে আসে শহীদুল্লা কায়সারের ‘মুন্না’ গল্পে। একুশের প্রতিজ্ঞা ছোটো মুন্নার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। তাই মিছিলে হাঁটার জন্য সে তার খুব মূল্যবান ইচ্ছা, রিক্সা চড়া বাতিল করে। রাস্তায় পুলিশি প্রহরা, সাঁজোয়া গাড়ির ভিড়, ১৪৪ ধারা ঘোষণা সবই গল্পকার সুনিপুণ দক্ষতায় গল্পে চিত্রিত করেছেন। একদিকে পুলিশের প্রহরা আর অন্যদিকে সেই প্রহরাকে অতিক্রম করার জন্য ছাত্রদের সাহস। তখনই গল্পের অন্যান্য চরিত্রদের পরিচয় ঘটে—আকবর, হালিমা, পারুল। ভাষা আন্দোলনে



মেয়েরাও যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তার প্রমাণ মেলে গল্পের বয়ানে। মেয়েদের নেতৃত্বে হালিমা। তার সাহসিক উচ্চারণ—

“ভূমিষ্ঠ হয়ে যে ভাষায় ‘মা’ ডেকেছিলি তাকে বাঁচানো কি তোমার ফরজ নয়!”<sup>১৭</sup>

আকবর পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। আর হালিমা আকবরের রক্তমাখা জামাকে প্রতিবাদের পতাকা করে নেয়। প্রেমের পরিণতি ঘটে প্রতিবাদে। অন্যদিকে মুন্নাদের মিছিলে হাকিম ভাষার মাথার খুলি উড়ে যায়। গল্পে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভাষা আন্দোলনের ত্যাগের, হারানোর, প্রতিদানের অঙ্গীকার।

ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত ইতিহাসের বয়ান প্রতিবাদের ভাষায় বাঙ্কায় হঠে উঠেছে ছোটগল্প গুলিতে। তাই মিলিটারি শাসনের মধ্যে অসংখ্য মানুষ শহিদদের জানাজায় যোগ দেয়। আন্দোলন তার সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়। ভাষা আন্দোলন তার পটভূমিকার ওপর ভিত্তি করে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য পরিবর্তনের দিকে এগোতে থাকে। ভাষা আন্দোলনই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে গড়ে তোলে ঐক্য, মানুষকে শেখায় সংঘবদ্ধতার শক্তি। আর এইসকল অবস্থার মধ্যে দিয়েই ২১শে ফেব্রুয়ারি পায় অমরত্ব। সাহিত্য শুধু সাহিত্যিকের এজিয়ারে সীমাবদ্ধ থাকে না, তাঁকে অতিক্রম করে হয়ে ওঠে সমাজের। সকল ভাষার সকল সাহিত্যই কথাটি সত্য। বাংলাদেশ গঠনের ইতিহাসে রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে ভাষা আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ ভাষা আন্দোলনই প্রথম পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন প্রতিফলিত হয়েছে সমাজ ও ভাষা কেন্দ্রিক ঐক্যের সূত্ররূপে। ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’—এই দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন একটি দেশকে গড়ে তুলেছিল। তাই বাংলা ভাষা হয়ে ওঠে সে দেশের মানুষের সাহস, অবলম্বন, অঙ্গীকার। একইসঙ্গে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের অগ্রগতিকে সূচিত করেছে ভাষাইদলা।

#### তথ্যসূত্র

১. আহমদ রফিক, ‘ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও কিছু জিজ্ঞাসা’, ঢাকা, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৫।
২. শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), ‘একুশের প্রবন্ধ ‘৯২’, ঢাকা : বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ১৬।
৩. তদেব, পৃ. ১৭।
৪. মজহারুল ইসলাম এবং ড. চিত্ত মণ্ডল (সম্পা.), ‘মহান একুশে (পরিশিষ্ট অংশ), কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ৪৬৯।
৫. তদেব, পৃ. ৪৭১।
৬. খন্দকার গোলাম মুস্তাফা, ‘যেন ভুলে না যাই’ (ড্র.) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), একুশে ফেব্রুয়ারি, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ২৩৫।
৭. আনিসুজ্জামান, ‘ছুটি’ (ড্র.) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), একুশে ফেব্রুয়ারি, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ১৫৭।
৮. সুনীতিমোহন বিশ্বাস, ‘বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’ (দ্বিতীয়), কলকাতা, নান্দনিক, ২৫বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ২৮।
৯. কবিরউদ্দিন আহমদ, ‘একুশের ইতিহাস’ (ড্র.) মজহারুল ইসলাম এবং ড. চিত্ত মণ্ডল (সম্পা.), মহান একুশে, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ২৪৬।
১০. খন্দকার গোলাম মুস্তাফা, ‘যেন ভুলে না যাই’ (ড্র.) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), একুশে ফেব্রুয়ারি, কলকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ২৩৭।
১১. তদেব, পৃ. ২৩৭।
১২. সুনীতিমোহন বিশ্বাস, ‘বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস’ (দ্বিতীয়), কলকাতা, নান্দনিক, ২৫বৈশাখ ১৪২০, পৃ. ২৮-৩০।
১৩. সাইইয়িদ আতীউল্লাহ, ‘হাসি’ (ড্র.) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), একুশে ফেব্রুয়ারি, কলকাতা, নবজাতক

## OPEN EYES

- প্রকাশন, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ১৪৬।
১০. তদেব, পৃ. ১৪৯।
১১. তদেব, পৃ. ১৫৪।
১২. আতোয়ার রহমান, “অগ্নিবাক” (ড্র.) হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), একুশে ফেব্রুয়ারি, কলিকাতা : নবজাতক প্রকাশন, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, পৃ. ১৮৩।
১৩. শহীদুল্লাহ কায়সার, ‘মুন্না’ (ড্র.) মজহারুল ইসলাম এবং ড. চিত্ত মণ্ডল (সম্পা.), মহান একুশে, কলিকাতা, নবজাতক প্রকাশন, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১৪৮।

---

অভিষেক প্রামাণিক  
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ,  
নূর মহম্মদ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ।

## সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : নাটকে 'আত্মপরিচয়'

সুভাষ মণ্ডল

বিশ শতকের মধ্যগগনে যখন পেশাদারি থিয়েটার নাচ, গান, রঙ্গ রসিকতা ও যৌনতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দর্শক আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়েছে সেইসময়ে ছয়ের দশকে মধ্যে আগমন অভিনেতা ও নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৫-২০২০)। গ্রুপ থিয়েটারে নয় বরং বেছে নেন তিনি পেশাদারি মঞ্চকেই। পেশাদারি থিয়েটারকে উজ্জীবিত করা ও হারিয়ে যাওয়া দর্শককে ফিরিয়ে আনতে তিনি যেমন সচেষ্ট হয়েছেন তেমনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও নিজের মনের মত নাটকের অভাবে কলম ধরেছেন। যদিও পুরাণাশ্রিত কিংবা পারিবারিক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালীন মনস্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও উদ্বাস্ত সমস্যার মত বিষয় নিয়ে নাটক লেখার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন অধুনাতন জীবন ও সমকালের জীবন যন্ত্রণার অনুভবে শিউরে ওঠা বাংলা নাটক। ফলশ্রুতিতে আমরা পেলাম তাঁর একাধিক নাটক, যার সংখ্যা ত্রিশ কিন্তু প্লট নির্মাণের অক্ষমতায় বিদেশি নাটকের ভাবানুবাদ ও বঙ্গীকরণের মাধ্যমে সেগুলিকে মঞ্চস্থ করেছেন। যদিও বেশ কিছু মৌলিক নাটক তিনি লিখেছেন। অনুবাদ নাটকের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—'বিধি ও ব্যতিক্রম' (ব্রেস্টের 'একসেপশন অ্যাণ্ড দ্য রুল' অবলম্বনে, ১৯৬১), 'রাজকুমার' (১৯৭৪, ক্লিফোর্ড ওডেটসের 'দ্য বিগ নাইফ' অবলম্বনে), 'বৃহন্নলা' (১৯৭৮, শন ও'কেসির 'দ্য শ্যাডো অফ এ গানম্যান' অবলম্বনে), 'টিকটিকি' (১৯৭৯, অ্যান্টনি শেফারের 'স্লিথ' অবলম্বনে), 'ফেরা' (১৯৯০, ফ্রিডরিশ ডুরেনমারের 'দ্য ভিজিট' অবলম্বনে)। সব মিলিয়ে তিনি ছয়টি মৌলিক নাটক লিখেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'মহাসিমুর ওপার হতে' (১৯৮০), 'ন্যায়মূর্তি' (১৯৯৬), 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব' (২০১০), 'ছাড়িগঙ্গা' (২০১২) ইত্যাদি। তিনি আবার রবীন্দ্রনাথের চারটি গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন, একে সংরূপান্তর বলা যায়, এও একধরনের অনুবাদ। সেগুলি হল—'পয়লা নম্বর' (২০১৫), 'বোষ্টমী' (২০১৫), 'মাস্টারমশায়' (২০১৫) এবং 'হালদার গোষ্ঠী' (২০১৫)।

২

সাহিত্য যেমন সমাজের দর্পণ তেমনি জীবনেরও দর্পণ একথা অনায়াসেই বলা চলে। সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত যুক্তি, বুদ্ধি ও ভাবনার ছায়া প্রতিফলিত হয় তাঁর সৃষ্টকর্মে। সেই সৃষ্টিকর্ম কবিতা নাটক, কথাসাহিত্য কিংবা প্রবন্ধ যাই হোক না কেন? সাহিত্য মানে তা কোনও না কোনও ভাবেই ব্যক্তি প্রক্ষেপণ। নাট্যকার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও তার ব্যতিক্রমী নন। তাঁর 'নাটকসমগ্র' আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমরা পেয়ে যায় বেশ কিছু নাটকে আত্মজৈবনিক উপাদান। আত্মজীবনী জীবনচরিতেরই অন্তর্ভুক্ত। যদিও জীবনচরিত সম্পূর্ণতা হতে পারে সেটি আত্মজীবনী হলেই। আত্মজীবনী কী? উত্তরে বলা যায়, স্বয়ং লেখক যখন নিজের জীবনী রচনা করেন। তবে আত্মজীবনী লেখার জন্য লেখক তথা অষ্টাকে সচেতনতার সঙ্গে শিল্পরূপ দিতে হয়, নইলে শিল্পসত্তা ক্ষুণ্ণ হয়। প্রাসঙ্গিকক্রমে সমালোচক আব্রাহাম কলির বাংলায় রূপান্তরিত একটি মন্তব্য স্মরণীয়—

“কোনও লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখতে যাওয়া যেমন তৃপ্তিকর তেমনি কঠিন। নিজের কোনও অকীর্তির কথা বলতে গেলে বুকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকদের কাছে কণ্ঠসীড়াদায়ক।”

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই সমস্যাকে যথেষ্ট দক্ষতার সাথে পরিহার করতে সমর্থ হয়েছেন। আত্মজৈবনিক উপাদানে সমৃদ্ধ নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে—'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব' (২০১০), 'মহাসিমুর ওপার হতে' (১৯৮০), 'আত্মকথা' (২০০৮), 'আরোহণ' (১৯৯৪)। এরমধ্যে 'তৃতীয় অঙ্ক, অতএব' (২০১০) নাটকটিই প্রধান, বাকি নাটকগুলিতে

মণ্ডল, সুভাষ : সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : নাটকে 'আত্মপরিচয়'

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 1, June 2022, Page : 37-42, ISSN 2249-4332

প্রচ্ছন্ন ভাবে নাট্যসংলাপে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত।

‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ (২০১০) নাটকটি সিমন্ গ্রে এর ‘দ্য লাস্ট সিগারেট’ নাটকের অনুকরণে নির্মিত সৌমিত্রের আত্মকথনমূলক সৃষ্টি। এ বিষয়ে নাট্যকার আমাদের জানান—

“Simon এর জীবন এবং আমার জীবনের একেবারেই কোনও মিল নেই। দুটো দেশের সমাজ, সংস্কার সবই আলাদা, আমার মনে হয়েছিল এই তিন অভিনেতার ছকটা ব্যবহার করে আত্মজীবনীমূলক একটা নাটক লিখলে কেমন হয়?”<sup>১</sup>

ফলশ্রুতিতে লিখিত রূপ দিলেন নাটকটির। নাটকটি নির্মিত হল তিনটি অঙ্ক আর পাঁচটি দৃশ্যের সমন্বয়ে। অভিনয়ে রয়েছে তিনটি সৌমিত্র। নাটকটি মৃত্যুচিন্তা দিয়ে শুরু হয়েছে আর অনিবার্যভাবেই চলে গেছে তার জীবনের দিকে। জীবন তার বাঁকে বাঁকে কেমন সব দান রেখে গেছে তারই এক অভূতপূর্ব দর্শন আমরা নাটকটির মাধ্যমে খুঁজে পাই।

এবার জেনে নেওয়া যাক তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু কথা। সৌমিত্র ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন কৃষ্ণনগরে। এই কৃষ্ণনগরের সি. এম. এস স্কুলে তিনি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তেন। নাটকটির মাধ্যমে জানতে পারি তাঁর পরিবারের কথা। পরিবারে—

“বাবা মোহিত চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন আটাল বছর বয়সে। মা আশালতা, তিরানববই, বিছানায় water bed এ বেঁচে আছেন। দাদা সম্বিং তেল কোম্পানিতে বড় চাকরি করে retire করে। ছোটভাই অভিজিৎ মিলিটারিতে কর্নেল হয়ে retire করে। আমাদের একটাই বোন অনুরাধা।”<sup>২</sup>

বিবাহ হয় ফুটবল খেলোয়াড় রণজিৎ সিনহার সাথে। সৌমিত্রের বাবা ওকালতি না করে সরকারি চাকরি করেছিলেন। সরকারের সিভিল সাপ্লাই দপ্তরে চাকরি বলে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে হতো। পিতার চাকরি সূত্রে স্থানান্তরের কারণে নানা স্থানে তাঁদেরও যেতে হয়েছে। ফলস্বরূপ অর্জন করেন নানা অভিজ্ঞতা। তবে তিনি এমন পরিবারে জন্ম নেন যেখানে বাড়ির ঠাকুরদা, বাবা, মা, ভাই বোন সকলেই সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কাজেই তাঁর জীবন জীবিকার রসদ তিনি অতি সহজেই পরিবার সূত্রে পেয়ে যান। বাবার চাকরি সূত্রে প্রথমে তাঁদের পরিবারকে যেতে হয়েছিল বারাসাত সেখান থেকে তিনি এসেছিলেন হাওড়াতে। এখানেই স্ত্রী দীপার সাথে প্রথম দেখা ও আলাপ হয়। তখন দীপা ছিল সৌমিত্রের বোন অনুরাধার বন্ধু, এই দীপাকে বিবাহ করেন তিনি।

সৌমিত্র ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া জেলা স্কুলের ছাত্ররূপে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৫১-১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ভর্তি হন সিটি কলেজে আর প্রথম আই.এসসি পরে বাংলা অনার্স নিয়ে বি.এ পাশ করেন। সৌমিত্রের এই কলেজ জীবনেই শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্য তাঁকে তাঁর অভিনয়ের জগতে শ্রেষ্ঠত্বের শিক্ষা দিয়েছে। কারণ সমসাময়িক পাঠকালীন সময়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর বেশ কিছু নাটক তিনি দেখেন এবং সে সম্পর্কে জানান—

“একটা বড়ো ভাগ্য বলতে হবে যে কলকাতায় থিয়েটারে প্রথমেই যা দেখেছিলাম তা শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়।”<sup>৩</sup>

নিজেকে সৌভাগ্যবান বলার কারণ এর ফলে তাঁকে কখনও খারাপ অভিনয় অনুসরণ, শিক্ষা বা অভ্যাস লাভ করতে হয়নি। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি শিশিরকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় তাঁর। সেদিনের সেই সাক্ষাৎকে সৌমিত্র নিজেই বলেছেন—

“সত্তরের সঙ্গে চব্বিশের যেন একটা বন্ধুত্বই হয়ে গেছে।”<sup>৪</sup>

আর সেই বন্ধুত্বের সূত্রেই নাট্যাভিনয়ের পূর্বসূরি রূপে শিশির ভাদুড়ী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দান করেছেন নিজের প্রতিভা, গুণাবলি ও অভিজ্ঞতা, ফলস্বরূপ ‘প্রফুল্ল’ নাটকের সুরেশ এর চরিত্রে সৌমিত্র অভিনয় করেছেন স্বাচ্ছন্দ্যে, আর কিভাবে নাটক পড়তে হবে সেটিও আয়ত্ত করেছিলেন আজীবনের আচার্যস্বরূপ শিশিরকুমারের জবানবন্দীতে—

“এরপর যখন পড়বে তখন গোয়েন্দার মত পড়বে। Read between the lines—এই নাটকের তলায় একটা অ-লিখিত নাটক আছে—সেটার কোথায় কি আছে খুঁজে বের করবে।”

এরপর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাট্যগুরু কথ্য অনুযায়ী ‘বিধি ও ব্যতিক্রম’ নাটকটির অনুবাদ করেন কিন্তু এম. এ. পাঠকালীন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় এর নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে নাট্যদল গঠন করে দিল্লি চলে যান। এরপরই তাঁর প্রথাগত পড়াশোনার পাঠ বন্ধ হয়ে যায়, পরীক্ষার প্রস্তুতি না নেওয়ার কারণে। পরবর্তীতে তিনি আকাশবাণী কলকাতার রেডিওর ঘোষকের কাজ করেন আর অভিনয় জগতে আসেন বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ‘অপুর সংসার’ সিনেমার মাধ্যমে। তিনি তাঁর ১৪টি ছবিতে অভিনয় করেছেন। এছাড়াও অভিনয় করেছেন তপন সিংহ, মৃগাল সেন, অসিত সেন, অজয় কর, তরণ মজুমদার এমনকি বিজয় বসুর ছবিতেও। জীবনে শিশির ও সত্যজিৎের সান্নিধ্যেই তাঁকে আজ মহীরুহে পরিণত করেছে। তবে মনে রাখতে হবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যখন বাংলা সিনেমার নায়করূপে এলেন তখন তাঁর টিকে থাকার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কারণ সামনে ছিল পাহাড়সম অভিনেতা মহানায়ক উত্তমকুমার। তবে নিজস্ব মনন, যুক্তি ও আধুনিক ভাবনা দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছিলেন তিনি।

সৌমিত্র খুব অনুভূতিশীল ছিলেন, মানুষের কষ্টে কষ্ট পেতেন। যদিও তিনি ১৯৪৩ এর মন্বন্তর, দেশভাগ, তাঁর কৈশোর জীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী সামাজিক অস্থিরতার পাশাপাশি করুণ দুর্ভিক্ষ, মানুষের অসহায় যন্ত্রণা এবং অগণিত মৃত্যুর সাক্ষী থেকেছেন। আবার সাধারণ মানুষের স্বার্থে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামতেও তিনি পিছপা হননি। ‘অভিনেতৃ সংঘ’-এর দ্বারা ১৯৬০ সালের দিকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে এক বিরাট আন্দোলনে সামিল হন। পরবর্তীতে অনেকে আন্দোলন থেকে সরে গেলেও তিনি কিন্তু সরে যান নি। কলেজ জীবনে ছাত্র ফেডারেশন যেমন করেছেন, তেমনি নানা বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে থেকেছেন আমৃত্যু পর্যন্ত। সৌমিত্রের দেশের প্রতি অপারিসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। এটি বাড়ির থেকেই তার রক্তে মিশে গিয়েছিল কারণ তার ঠাকুরদা স্বদেশী করে জেল খেটেছিল আবার ১৯৩০ এর দশকে তাঁর বাবা আইন অমান্য ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় জেল খেটেছেন। এই কারণেই হয়তো বারাসাতে একজন আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর শিখ বন্দীর ‘কোন জাত হো বেটা?’ এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলতে পেরেছিল ‘ইণ্ডিয়ান’।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক আলাদা অনুভূতির জায়গা ছিল। ২৩শে শ্রাবণ রবিঠাকুর মারা গেছেন এই খবর শুনে তাঁর মায়ের ক্রন্দন করতে তিনি দেখতে পান। এই ক্রন্দনের অর্থ সে সময় ভালোভাবে বুঝতে না পারলেও রবীন্দ্রনাথের প্রতি সৌমিত্রের ভালবাসার জায়গা তৈরি হয়ে যায়। যদিও সে সময় তিনি ছিলেন বয়সে খুবই ছোটো। এই বিষয়ে তাঁর অসাধারণ স্বীকারোক্তি—

“কবির মৃত্যুসংবাদ ওই গৃহবধুর মনে কি বেদনার সঞ্চার করেছিল জানি না, কিন্তু আমার কাছে তা মৃত্যু নয় একটা বিরাট জীবনকে ভালোবাসার প্রথম পদক্ষেপ তৈরি করেছিল।”

পরবর্তীতে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষের কবিতা এমনকি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার প্রতিও তাঁর ভালোবাসার জায়গা তৈরি হয়ে যায়। আবার একজন অভিনেতা হয়েও তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কলেজ বন্ধু নির্মাল্য আচার্যের সাথে ‘এক্ষণ’-এর মত একটি মননশীল পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকাটির প্রচ্ছদ করে দিয়েছিলেন স্বয়ং বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

অভিনেতার পাশাপাশি সৌমিত্র ছিলেন একজন কবি। তিনি কবিতা লিখেছিলেন কিশোরবেলার নতুন ভাবে উদ্গত হওয়া রোমান্টিকতা থেকে। যদিও আমরা জানি কবিতার প্রতি তাঁর ভালোবাসার জায়গা অনেক আগে থেকেই কারণ তিনি তা আমাদের জানিয়েছেন ‘আত্মপরিচয়’ বইটিতে—

“বাবার কাছেই আমার আবৃত্তির হাতে খড়ি এবং কবিতার প্রতি ভালোবাসার জন্ম। আর একটা বিষয়ও

## OPEN EYES

এখানে উল্লেখযোগ্য। আমার ছোটবেলায় আমার মা আমাকে কবিতা বলে ঘুম পাড়াতেন। ফলে খুব ছোট থেকেই কবিতার প্রতি আমাদের ভাইবোনাদের একটা স্বাভাবিক ভালোলাগা তৈরি হয়ে যায়।”<sup>১৮</sup> পরবর্তীকালে বন্ধু গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় ও কবিবন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহে কবিতা লিখেছেন পূর্ণমাত্রায়।

জীবন থাকলে মৃত্যু অনিবার্য, সেই মৃত্যু থেকে পালাবার কিংবা ভয় পাওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই বরং সেই মৃত্যুর মতো সত্যকে মেনে নিলেই জীবনে এক আলাদা অনুভূতি আসে। যে অনুভূতি মানুষের বেঁচে থাকার এক অন্যতম উপাদান। নাটকের শেষপর্বে মৃত্যু সম্পর্কে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তাই কোন ভীতি নয় বরং সেই মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় এই রবীন্দ্র কবিতার (‘রূপ নারানের কুলে’) উচ্চারণে :

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এজীবন —  
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে  
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।”<sup>১৯</sup>

‘মহাসিন্ধুর ওপার হতে’ (১৯৮০) নাটকটি মৌলিক নাটক। এক কবি ও তার মেয়ের দারিদ্র ভরা জীবন ও তার থেকে উত্তরণের এক সুন্দর আলোচ্য নাটকটি। তিনি তাঁর কবিবন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে স্থান দিয়েছেন এই নাটকে, যদিও তা নাট্য দ্বন্দ্বিক সৃষ্টির কারণে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের যুগ যখন শেষ হয়ে গেছে তখন বেশ কিছু শিল্পীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। নাটকের অন্যতম চরিত্র পারুলবালার মাধ্যমে নাট্যকার সেই বার্তা দেন—

“বড় অভাবে পড়েছিলুম বাবু। বড়বাবুর থিয়েটার উঠে গেল তারপর থেকে আমাদেরও কাজকর্ম কমে গেল। .... খেতে পাচ্ছিলুম না, বাড়ি ভাড়া দিতে পাচ্ছিলুম না।”<sup>২০</sup>

কিন্তু তার জীবিকার দিশা খুঁজে পান উৎপল দত্তের গ্রুপ থিয়েটারে যোগদানের মাধ্যমে। সৌমিত্র থিয়েটারের একনিষ্ঠ কর্মীরূপে ছিলেন বলেই এমন ঘটনার সমন্বয়ে নাটকটির পসরা সাজিয়েছেন।

মারাঠি নাটককার মহেশ এলকুনচওয়ারের নাটক অবলম্বনে নির্মিত অনুবাদ নাটক ‘আত্মকথা’ (২০০৮)। নাটকটি আসলে একজন লেখকের দাম্পত্য জীবনে ঘটে যাওয়া নানা উত্থান পতনের লুকোছাপা কাহিনি, বিশেষ করে রয়েছে অসুখী দাম্পত্য জীবন। এই নাটকের মধ্যেও নাট্যসংলাপে আজাদ হিন্দ ফৌজের কথা বিবৃত। একজন কবি ও শিল্পী তার সৃষ্টকর্মের মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যতে টিকে থাকবেন কিনা তারই আক্ষেপ দেখি নাট্যচরিত্র শুভঙ্করের আত্মকথনে—

“.... এক এক সময় আমার নিজেরই এগুলো তামাদি বলে মনে হয়। তুমি আজকে তোমার রিসার্চের জন্য পড়ছ—আরও হয়তো দশ বরোজন ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে যারা পড়ছে—কিন্তু বিশ বছর বাদে সাহিত্যিক বলে আমাকে কেউ মনে রাখবে কিনা—কে জানে।”<sup>২১</sup>

এ যেন অনেকটা সৌমিত্র এরই আত্মপ্রক্ষেপণ। আমরা অবগত আছি যে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বামপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণেই এই নাটকে নাট্যচরিত্র শুভঙ্করের মাধ্যমে সৌমিত্রই যেন বলতে চেয়েছেন—

“সমস্ত রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বামপন্থী মোর্চার হয়ে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছি তখন।”<sup>২২</sup>

উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অতিরিক্ত লোভের পরিণামে চরম নিষ্ঠুরতার সাথে নিজের সুখী দাম্পত্য জীবনকে গলা টিপে হত্যা করে শেষ পর্যন্ত একাকী নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের এক ভয়াবহ কাহিনি ‘আরোহণ’ (১৯৯৪)। নাটকটি মার্কিন নাট্যকার লিলিয়ান হেলম্যানের ‘দ্য লিটল ফক্সেস’ অবলম্বনে লেখা। এই নাটকে পরোক্ষভাবে আমরা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি সংলাপ ব্যবহার করতে দেখেছি যেখানে নাটকে তিনি ব্যবহার করেছেন ছায়া চরিত্রের মাধ্যমে এইরূপে—

“মিস্টার দাশগুপ্ত ওগুলো দেখতে চাইলেন যে। আমি যখন গুঁকে বললাম সুভাষচন্দ্র মালদায় মিটিং

করতে এসে আমাদের বাড়িতে চা খেয়েছিলেন, তখন উনি খুব আগ্রহ দেখালেন।”<sup>১৩</sup>  
কিন্তু বিষয়টি বাস্তবে প্রামাণ্য, কারণ সৌমিত্র ‘আত্মপরিচয়’ বইটিতে জানিয়েছেন—  
“আমাদের বাড়িতে কংগ্রেসের সভা করতে সুভাষচন্দ্র বোস এসেছিলেন। শুনেছি, তাকে আমার মা’র  
বিয়ের সময় পাওয়া একটা অসাধারণ ভালো বোনা চাইনা টি সেট এ চা খেতে দেওয়া হয়েছিল।”<sup>১৪</sup>  
জীবনের অভিজ্ঞতার নির্যাস এইরূপেই প্রয়োগ করেছেন তিনি, সৃষ্ট নাট্যকর্মে।

৩

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। এই পরিচয় ছাপিয়ে তিনি কবি, নাট্যকার, বাচিকশিল্পী ও নাট্যনির্দেশক এমনকি নাট্য প্রযোজক। নাট্যসাহিত্যে তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি যে পরিচয় দিয়েছেন তা অবিস্মরণীয়, এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আলোকশিল্পী তাপস সেন তাই বলতে দ্বিধাবোধ করেননি—

“উৎপল দত্তের পর আমি এই প্রথম একজন আধুনিক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নাট্যবিদকে পেলাম।”<sup>১৫</sup>  
তাঁর নাটকগুলি বিষয় বৈচিত্র্যে অভিনব। বিশেষ করে তাঁর আত্মজৈবনিক নানা উপাদান যোভাবে নাটকে জয়গা করে নিয়েছে এককথায় অনবদ্য। তিনি আমাদের তথা আপামর বাঙালির কাছে ‘আইডল’, কারণ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সবকিছুই সম্ভব হয় আর অনায়াসেই সে সব ক্ষেত্রে বিচরণ করা যায় তা তিনি আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সব্যসাচীর মত সমস্ত ক্ষেত্রে নিজেই পরখ করে দেখেছেন আর পেয়েছেন সাফল্য, এখানেই তিনি অনন্য।

#### তথ্যসূত্র

১. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ‘গদ্যসাহিত্য’, সাহিত্য-প্রকরণ, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৮৭।
২. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘লেখকের কথা’, নাটকসমগ্র : তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ২১৬।
৩. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’, নাটকসমগ্র : তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ১৯০।
৪. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘শিশিরকুমার ৪’, গদ্যসংগ্রহ : প্রথম খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, দে’জ পাবলিশিং, ২০১৬, পৃ. ১৫৭।
৫. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘শিশিরকুমারের স্মৃতি’, সৌমিত্র, অলক চট্টোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তী (সম্পাদ.), প্রতিভাস, ২০২০, পৃ. ৪৭৩।
৬. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘তৃতীয় খণ্ড, অতএব’, নাটক সমগ্র : তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ২১৩।
৭. তদেব, পৃ. ২০০।
৮. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘বাবা ছিলেন প্রিয়বন্ধু’, আত্মপরিচয়, কলকাতা, পত্রভারতী, ২০২১, পৃ. ২১৪।
৯. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’, নাটকসমগ্র : তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ২১৫।
১০. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘মহাসিন্ধুর ওপার হতে’, নাটকসমগ্র : প্রথম খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৫, পৃ. ৩৫৭।
১১. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘আত্মকথা’, নাটকসমগ্র : তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮, পৃ. ১৩৬।
১২. তদেব, পৃ. ১৩৫।
১৩. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ‘আরোহণ’, নাটকসমগ্র : দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সং, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৭, পৃ. ৯২।

## OPEN EYES

১০. সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, 'আমার যে দিন ...', আত্মপরিচয়, কলকাতা, পত্রভারতী, ২০২১, পৃ. ১৭৭।
১১. তাপস সেন, 'নাটকীয়', সৌমিত্র, অলক চট্টোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তী (সম্পা.), প্রতিভাস, ২০২০, পৃ. ১৪৭।

---

সুভাষ মণ্ডল  
পি এইচ. ডি গবেষক,  
বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়



‘গেরস্থর মেয়ে দিন-রাত্তির অমন কাগজে কলমে থাকলে, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়’—

উনিশ শতকে বাংলার স্ত্রীশিক্ষায় ‘অলক্ষ্মী’র নির্মাণ

শাশ্বতী রায়

উনিশ শতকে স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে অনেক লেখালেখি হয়েছে। স্ত্রীশিক্ষা এবং স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কোনও আড়াআড়ি বিভাজন সম্ভব নয়। অর্থাৎ রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী—এই দুই দলে তাঁদেরকে ভাগাভাগি করে দেওয়া যাবে না। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে কি শিখবে না—এই প্রশ্নটির চেয়েও তাঁদের কাছে যেটি বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল তা হল—মেয়েরা কী শিখবে, কী পড়বে? কেন পড়বে? মেয়েদের কী ধরনের শিক্ষা দেওয়া উচিত আর কোন ধরনের শিক্ষা তাঁদের চরিত্র গঠনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে—এই দ্বিবিধ জিজ্ঞাসা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার বিদ্বৎসমাজের আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের সামাজিক আদর্শ নির্মাণের যোগটি এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের সংবাদ সাময়িকপত্রের একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল স্ত্রীশিক্ষা। বহু পত্রিকাই মেয়েদের শিক্ষার ধরন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছে। স্ত্রীশিক্ষার ধরন নিয়ে বলতে গিয়ে তার ফলাফল সম্পর্কেও মতামত দিয়েছে পত্রিকাগুলি। পত্রিকাগুলির বাইরেও, ছোটো-ছোটো পুস্তিকায় স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে অজস্র বিতর্ক রচনা গড়ে উঠেছিল এই সময়েই। সেখানেও স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী ও তার পরিণতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে ‘ঘর’ ও ‘বার’-এর কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে পাব এই সব লেখাগুলিতে। একদিকে বলা হচ্ছিল—শিক্ষা মেয়েদের ঘরের কাজে পটু করে তুলবে। অর্থাৎ মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে গৃহস্থালির কাজকে সুসম্পন্ন করে তোলবার জন্য। এরই বিপরীতে দেখানো হল—শিক্ষার ফলে মেয়েরা আর ‘ঘরমুখো’ হয়ে থাকবে না, ক্রমশই ‘বারমুখো’ হবে, যার ফলে ‘ব্যভিচার’ সংঘটনের পথ আরও প্রশস্ত হবে। একদিকে রইল ‘ঘরমুখো’ ‘ভালো’ মেয়ে অন্যদিকে ‘বারমুখো’ ‘মন্দ’ মেয়ে—স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক রচনার সঙ্গে এভাবেই জুড়ে গেল শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের ‘ভালো’ ‘মন্দ’-এর ধারণা। মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে, শিক্ষার গুণে মেয়েরা যাতে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না পড়ে সেটি খেয়াল রাখতে হবে—এই ছিল স্ত্রীশিক্ষার পক্ষাবলম্বীদের মত। ‘শারীরিক’ ও ‘প্রবৃত্তিগত’ কারণেই স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রেও উভয়ের জন্য আলাদা শিক্ষাবিধি প্রবর্তন করা উচিত। এ থেকেই মেয়েদের পাঠ্য তালিকা তৈরিতে একধরনের বিভাজন পদ্ধতি গ্রহণ করা হল। পাঠ্যসূচিতে কী থাকবে, কী থাকবে না তা নিয়ে সংস্কারকরা কখনোই এক মত হতে পারেন নি। মেয়েদের যেমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, তেমন শিক্ষা আদৌ দেওয়া হচ্ছে কিনা—এই প্রশ্নটিই তাঁদের মতপার্থক্যের প্রধান কারণ।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচার ও প্রসার উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে কতগুলো অভিধার জন্ম দিয়েছিল, তার মধ্য থেকে বর্তমান আলোচনায় আমরা বেছে নিয়েছি ‘অলক্ষ্মী’ প্রসঙ্গটি। এই অভিধার মধ্যেই আরও কতগুলি শব্দ জুড়ে আছে—‘মন্দ’, ‘বেহায়া’, ‘বেহদ’ ইত্যাদি। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীপক্ষের যুক্তি উনিশ শতকের বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে ‘অলক্ষ্মী’র স্থানটি পোক্ত করলেও, স্ত্রীশিক্ষার পক্ষাবলম্বীরা এই আলোচনা থেকে যোজন দূরত্বে ছিলেন—এমনটি মনে করার কোনও কারণ নেই। বরং শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারণে তাঁরাও ‘ভালো’ মেয়েদের বিপরীতে দৃষ্টান্ত হিসেবে রাখছিলেন ‘মন্দ’ মেয়েদের। সমকালীন লেখালিখির সাক্ষ্য বিষয়টি বিশদ করা যেতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীপক্ষের

রায়, শাশ্বতী : ‘গেরস্থর মেয়ে দিন-রাত্তির অমন কাগজে কলমে থাকলে, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়’—উনিশ শতকে বাংলার স্ত্রীশিক্ষায় ‘অলক্ষ্মী’র নির্মাণ

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 19, No. 1, June 2022, Page : 43-51, ISSN 2249-4332

## OPEN EYES

মতে মেয়েরা লেখাপড়া শিখে ‘পুরুষালি’ গুণাবলির অধিকারিনী হচ্ছে। সংসারে স্ত্রী ও পুরুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন দায়িত্ব পালন করে, তাদের মধ্যে প্রকৃতিগত তারতম্যও রয়েছে, তাই পাঠক্রমে এক বিভাজন নীতির প্রয়োজন। এ থেকেই স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে এক নতুন বিতর্কের সূত্রপাত—স্ত্রীশিক্ষার প্রণালী কী হবে? মেয়েদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ঠিক কী, এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই, তবে প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছিলেন—

সেই শিক্ষাপ্রণালীই উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট যদ্বারা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দেয়ার কেবল এই লক্ষ্য যে তাঁহারা যে কেবল সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সাধারণ বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইবেন তাহা নহে, কিন্তু কন্যা, ভগিনী, ভার্য্যা ও মাতার পদে উপযুক্ত হইয়া ঐ সকল সম্বন্ধের কর্তব্য সাধন করিতে সক্ষম হইবেন এবং জনসমাজে তাঁহাদের নির্দিষ্ট ব্রত পালন করিবেন।’

১২৮০ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ে বামাবোধিনী পত্রিকা-য় এই লেখা প্রকাশিত হবার ঠিক দুবছরের মাথায় ১২৮২ বঙ্গাব্দের আষাঢ় সংখ্যায় ‘স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যিকতা’ নামে একটি লেখায় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষাবলম্বীরা বিপক্ষদের আশঙ্কার কথা মেনে নিয়েই একধরনের ‘উত্তম শিক্ষা’ প্রচলনের প্রস্তাব দেন। এখানে ‘উত্তম শিক্ষা’ বলতে গৃহকর্ম, গৃহপরিচালনা, সন্তানপালন, দাম্পত্য ভাবনা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত শিক্ষাকেই বোঝানো হয়েছে।<sup>৬</sup> খেয়াল করবার মতো স্ত্রীশিক্ষার পক্ষের লোকেরা সামাজিক বিতর্কসভায় একধরনের আদর্শ ‘গৃহলক্ষ্মী’র কথা বলছিলেন; বিপক্ষদের ‘অলক্ষ্মী’র ধারণাকে মতাদর্শের দিক থেকে মেনে না নিলে ‘গৃহলক্ষ্মী’র এমন নির্মাণ আদৌ সম্ভব ছিল?

স্ত্রীশিক্ষার বিপরীতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের প্রাথমিক আপত্তি ছিল, শিক্ষালাভ করতে হলে মেয়েদের বাইরে যেতে হবে অর্থাৎ ‘অন্দর’ ছেড়ে ‘সদরে’ পা বাড়াবে মেয়েরা, তাতে ব্যাভিচার ঘটাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সংবাদ প্রভাকর এ প্রকাশিত (৩১.১.১২৫৬) ‘স্ত্রীবিদ্যা এবং চন্দ্রিকা’য় লেখা হয়েছিল—

‘বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যাভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে। কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টিপথে পড়িলে অসং পুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ।’<sup>৭</sup>

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল মেয়েরা শিক্ষিত হলে সামাজিক আদর্শ মানবে না। তারা ‘ব্যভিচারিণী’ হবে, ‘স্বেচ্ছাচারিণী’ হবে, গুরুজনকে তাচ্ছিল্য করবে এবং সামাজিক রীতি নীতি, আচার বিধি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। স্বর্কণ্ডভকরী পত্রিকায় প্রকাশিত (আশ্বিন, ১৭৭২ শক) ‘স্ত্রীশিক্ষা’ লেখাটিতে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিপক্ষ মতগুলিকে তুলে ধরেন। এর মধ্যে চতুর্থ মতটি ছিল, মেয়েরা বিদ্যাবতী হলে ‘স্বেচ্ছাচারিণী’ ও ‘মুখরা’ হয়ে উঠবে, তাই তাদের সবসময়ে ‘অজ্ঞানানুকূলে নিষ্কিপ্ত’ রাখাই উচিত।<sup>৮</sup> সমাজদীপিকা-য় প্রকাশিত (১৫ ভাদ্র ১২৯২) ‘স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতা’ লেখাটিতে স্ত্রীশিক্ষার পরিণামে নানান অনিষ্টের কথা বলা হয়। প্রথমত, শিক্ষা নারীজাতির মধ্যে বিলাসিতা এনে দেবে। শিক্ষিত স্ত্রীলোক হাতে কালি লেগে যাওয়ার ভরে রান্নাবান্না করবে না, হাতের তালুতে কড়া পড়ে যাবার আশঙ্কায় বাসন মাজবে না; সে উলের মোজা বুনবে আর অবসরকালে ‘দুর্গেশনন্দিনী’ পড়বে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষকে ‘বশ্যতা’ স্বীকার করতে হবে। তৃতীয়ত, স্ত্রীশিক্ষার ফলে ‘ব্যভিচার’ সংঘটনের পথ প্রশস্ত হবে। চতুর্থত, মেয়েদের উচ্চশিক্ষা কখনোই সম্ভব নয়, কারণ উচ্চশিক্ষার জন্য তার যদি বাইরে যায় তবে সংসার দেখাভাল করবে কে। শেষত, স্ত্রীশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা অনিবার্য। সেক্ষেত্রে মেয়ে আর ‘অবগুণ্ডনবতী ললনা’ হয়ে থাকবে না।<sup>৯</sup> শিক্ষা ‘স্বাধীন’ হতে শেখায় কিন্তু এই স্বাধীনতা মেয়েদের ‘সতীত্ব’ নাশ করতে পারে, স্ত্রীধর্ম রক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং মেয়েরা ‘কুপথগামিনী’ হতে পারে।<sup>১০</sup> পুরুষ মন্দ কর্ম করতেই পারে, তাদের যথেষ্টাচারিতা সমাজপতিদের ভয়ের কারণ নয়, কিন্তু স্ত্রীলোক শিক্ষিত হয়ে ‘স্বাধীন’ হতে চাইলে মুশকিল বৈকি। শিক্ষার গুণে মেয়েরা লজ্জাহীন হয়ে পড়ুক, সামাজিক আদর্শকে প্রশ্ন করুক এমনটা কেউই চাননি—স্ত্রীশিক্ষার বিপক্ষের লোকেরা নয়, পক্ষের লোকেরাও নয়।

জীৱশিক্ষৱ বিপক্ষ দলেৱ লোকৱা প্ৰথমে সংক্ষৱবশে জীৱশিক্ষৱ বিৰোধিতা কৰে নানান মন্তব্য কৰেছিলেৱ, জীৱশিক্ষা শাস্ত্ৰসম্মত নয়, তা দেশাচাৰ বিৰোধী, তা কেবল সমাজে অকল্যাণ ডেকে আনে না, নাৱীজীৱনেও অমঙ্গল ডেকে আনে। লেখাপড়া শিখলে মেয়েৱা ‘বিধৱা’ হয়। এই ধৰনেৱ বিচিত্ৰ যুক্তি হাজিৱ কৰাৱ পাশাপাশি তাঁৱা এমন আৱও অনেক যুক্তি দিয়েছিলেৱ, যেখানে জীৱবিজ্ঞানেৱ সাধাৰণ সূত্ৰ ভুলে সামাজিক ও প্ৰাকৃতিক লিঙ্গৰূপকে এক কৰে ফেলা হয়েছিল। ১২৯৬ বঙ্গাব্দেৱ বৈশাখে বেদব্যাস লিখছে—

‘... প্ৰকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নাৱীৱ পক্ষে অমঙ্গলেৱ কাৰণ। কেননা, ইহা দ্বাৱা নাৱীৱ পুত্ৰ প্ৰসৱোপযোগিনী শক্তিগুলিৱ হ্ৰাস হয়। বিদূষী নাৱীৱগণেৱ বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদেৱ স্তনে প্ৰায়ই স্তনেৱ সঞ্চার হয় না। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদেৱ জৱায়ু প্ৰভৃতি বিকৃত হইয়া যায়।’

মেয়েদেৱ লেখাপড়া শেখা রক্ষণশীল সমাজপতিদেৱ কাছে যে কতটা ভয়েৱ কাৰণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা বোঝা যায় এই ধৰনেৱ অযৌক্তিৱ মন্তব্য থেকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মেয়েৱা লেখাপড়া শিখল, বাড়িৱ বাইৰে বেরোল। তাই সমাজপতিৱা এৱাৰ প্ৰশ্ন তুললেৱ শিক্ষাৱ ধৰন নিয়ে; মেয়েৱা লেখাপড়া শিখে যাতে ‘অলক্ষী’ হয়ে না পড়ে তাই জীৱশিক্ষাৱ পাঠক্ৰমে ধৰ্মশিক্ষা গুৰুত্ব পেলে। ১২৭৭ বঙ্গাব্দেৱ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বামাবোধিনী পত্ৰিকা য় ধৰ্মশিক্ষাৱ আৱশ্যকতাৱ কাৰণ দৰ্শানো হয়েছে। প্ৰথমত, যে শিক্ষা ধৰ্ম বিযুক্ত সেই শিক্ষায় অহেতুক আড়ম্বৰ প্ৰকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, জীৱলোকেৱ ‘সদগুণ’গুলি বিলুপ্ত হৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তৃতীয়ত, বিজাতীয়দেৱ অনুকৰণ কৰে ‘বিবি’ হৱাৰ সাধ জন্মায়। চতুৰ্থত, স্বাধীনতাৱ প্ৰকৃত ৱ্যৱহাৰ না জেনে ‘খেচ্ছাচাৰী’ হয়ে যাৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। একাৰণেই জীৱশিক্ষাৱ পাঠক্ৰমে ধৰ্মশিক্ষাৱ সংযুক্তিকৰণ এতটা আৱশ্যক।<sup>১</sup> পুৰুষেৱ ধৰ্মনিৰপেক্ষ শিক্ষায় ততটা ক্ষতি নেই, যতটা রয়েছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ জীৱশিক্ষায়। উনিশ শতকে খুব কমজনই ধৰ্মনিৰপেক্ষ জীৱশিক্ষাৱ কথা ভাবে পেৰেছেৱ। জীৱশিক্ষা বিস্তাৰেৱ সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন সমস্যা হাজিৱ হল—এৱ ফলাফল কী হৱে তাই নিয়ে। এই পৰিণতিৱ কথা জীৱশিক্ষাৱ বিৰোধীপক্ষেৱ লোকৱা বহুদিন আগে থেকেই বলে এসেছেৱ। শতকেৱ দ্বিতীয়াৰ্ধে জীৱশিক্ষাৱ সমৰ্থকৱাও এই নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়লেৱ। শিক্ষাৱ সঙ্গে মেয়েদেৱ ভালো মন্দেৱ যোগ কতটুকু, সেকথা বলতে গিয়ে বিভিন্ন লেখায় উঠে আসছিল একটাই প্ৰসঙ্গ—মেয়েৱা ধৰ্মেৱ সঙ্গে সংশ্ৰৱহীন হয়ে পড়ছে। যতৱাৰই জীৱশিক্ষাৱ প্ৰণালী সম্পৰ্কে অভিযোগ তৈৰি হয়েছে, ততৱাৰই বলা হয়েছে শিক্ষাৱ সঙ্গে ধৰ্মেৱ এই বিযুক্তিৱ কথা। বামাবোধিনী পত্ৰিকা ৱ ১২৮০ বঙ্গাব্দেৱ বৈশাখ সংখ্যাৱ একটা লেখায় ধৰ্মশিক্ষাৱ উপৱ এতটা জোৱ দেওয়ার কাৰণ দৰ্শানো হয়েছিল। সমাজপতিদেৱ আশঙ্কা ছিল মেয়েৱা শিক্ষিত হয়ে মুখৱা, খেচ্ছাচাৰী, উচ্ছৃংখল হয়ে পড়বে, রমণীসুলভ গুণগুলি ত্যাগ কৰে ‘মন্দা’ মেয়েমানুষ হয়ে উঠবে, ফলে সমাজে ভয়ংকৰ বিশৃঙ্খলা তৈৰি হৱে।<sup>২</sup> ‘বিকৃত শিক্ষা’য় মেয়েদেৱ সামাজিক আচৰণে কোনোৱকম ‘লক্ষ্মীশ্ৰী’ থাকছে না—এই আশঙ্কা থেকে সেদিনেৱ সমাজপতিদেৱ বড় অংশ ‘স্বীজনোচিত শিক্ষা’ৱ পক্ষে সওয়াল কৰেছিলেৱ।<sup>৩</sup> এই ‘বিকৃত শিক্ষা’ সমাজপতিদেৱ চক্ষুশূল, কাৰণ তা পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজৱ্যৱস্থাৱ বুনিয়াদকে একটু হলেও টলিয়ে দিতে পেৰেছিল। তাই সমাজে এত ‘মন্দ’, ‘বেহদ’, ‘বেহায়া’, ‘অলক্ষী’-ৱ বাস জীৱশিক্ষাৱ পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় দলেৱ মানুৰজনকে এতটা শক্তি কৰে তুলেছিল।

মেয়েৱা লেখাপড়া শিখলে কতটা ‘অলক্ষী’ হতে পাৰে তাৱ ৱ্যাখ্যা সাময়িকপত্ৰেৱ পৃষ্ঠায় নানাভাবে উঠে এসেছে। ‘দুৰ্গেশনন্দিনী’ৱ মতো উপন্যাস পড়া মেয়েৱা ৱ্যভিচাৰেৱ পথ বেছে নেয়—এই ছিল সমাজপতিদেৱ একাংশেৱ মত। এঁদেৱ কাছে মেয়েদেৱ উপন্যাসপাঠ ‘বিকৃত শিক্ষা’ৱই নামান্তৰ। শিক্ষাৱ সঙ্গে ‘মন্দ’ মেয়েদেৱ সম্পৰ্ক তৈৰি কৰাৱ ক্ষেত্ৰে যে কথাগুলি সেদিনেৱ তাত্ত্বিক আলোচনায় ৱাৱৱাৰ উঠে আসছিল তাৱই একধৰনেৱ প্ৰতিফলন আমৱা দেখেছিলাম সেই সময়েৱ সাহিত্যে, বিশেষ কৰে প্ৰহসনে। এমনই একটা দুটি প্ৰহসনেৱ উদাহৰণ টেনে আমৱা এই আলোচনাৱ বৃষ্টি সম্পূৰ্ণ কৰৱ। উনিশ শতকে জীৱশিক্ষাকে কটাক্ষ কৰে লেখা প্ৰহসনগুলিৱ একধৰনেৱ সামাজিক দায় ছিল। অন্তত লেখক প্ৰকাশকেৱ ষোষিত উদ্দেশ্যে তেমন কথাই বলা থাকত। মেয়েৱা লেখাপড়া শিখলে

## OPEN EYES

সমাজের সমূহ সর্বনাশ হবে; তারা ‘মুখরা’, ‘বেহায়া’, ‘স্বেচ্ছাচারিনী’ হয়ে যাবে, সর্বোপরি স্বামীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে—এই ছিল বিপক্ষ মতের প্রধান যুক্তি এবং আপত্তির জায়গা। স্ত্রীশিক্ষাকে আক্রমণ করে লেখা প্রহসনগুলির মোদা কথাও তাই। এই ধরনের প্রহসনে ‘শিক্ষিতা’ মেয়েদের মুখে এমন সব সংলাপ বসানো হয়েছে, তাদের দিয়ে এমন সব কাজ করানো হয়েছে—তাদের সেই বলা কথা ও করা কাজ পাঠকমনে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি স্বতঃবিরূপতা তৈরি করে দিতে বাধ্য। রাখাবিনোদ হালদারের *পাস করা মাগ* একটি সামাজিক প্রহসন। বইয়ের দ্বিতীয় আখ্যাপত্রে স্পষ্ট করে লেখা—‘স্ত্রী স্বাধীনের এই ফল/পতি হয় পায়ের তল।।’ যে মেয়ে পতিকে ‘পায়ের তলে’ রেখেছে তাকে সমাজ আর যাই বলুক ‘সতী’ তো বলবে না। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা ‘সতীত্ব’ হারাতে একথাটা কেবল সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় নয়, ছড়ার আকারেও লোকের মুখে মুখে ঘুরত—‘হলে নারী বিদ্যাবতী/কখনও না থাকে সতী।’<sup>১১</sup> কিরণশশী ও চাতকিনী হরিবাবুর দুই মেয়ে। বেপুন স্কুলে ‘হাইপ্রাইজ’ পাওয়া কিরণশশী ‘এখনকার বাদ্দালীর মেয়ের মতন মূর্খ’ নয়। সে স্বামীর ঘর করে না, শশুরবাড়ি তার কাছে গোরুর গোয়ালের মতোই বন্ধ।<sup>১২</sup> নিজের স্বামীকে সে ‘বানর অপেক্ষা মূর্খ’ মনে করে। এর বিপরীতে রয়েছে চাতকিনী। স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কথা কওয়া তো দূরের কথা, বিবাহের বহুদিন পরেও লজ্জা ত্যাগ করে সে তার স্বামীর সামনে পর্যন্ত আসেনি। রূপচাঁদ পক্ষীর তরজায় আমরা এমন কথা শুনি, ‘স্বাধীন রমণী ইদানী/ঘর ভাঙ্গানি দেশ ঢালানি/ভাতারকে বাঁদর নাচায়।’<sup>১৩</sup> ‘শিক্ষিতা’ কিরণশশীও বারবার ঘর ভাঙে এবং স্বামীকে ‘বাঁদর নাচানো’র মতোই নাজেহাল করে। প্রথম স্বামী শশিভূষণ উপযুক্ত না হওয়ায় কিরণশশী তাকে ‘স্বামীত্বপদে গ্রহণ’ করতে নারাজ, এই মর্মে সে স্বামীর কাছে উকিলের চিঠি পাঠায়। শশিভূষণ পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে কিরণশশীর মজ্জায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। সে মনে করত কিরণের সবসময় লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা উচিত, কারণ অন্য পুরুষ তাকে দেখলে তার ‘ইজ্জাং হানি’ হবে। উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে বিতর্ক তৈরি হয়ে উঠেছিল, সেখানে প্রথম প্রথম বিবেচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল—লেখাপড়া শেখার জন্য মেয়েরা ঘরের বাইরে যাবে কিনা। মেয়েরা ‘সদর’ এ গেলে তাদের ‘ইজ্জত নষ্ট’ হবার সম্ভাবনা রয়েছে—একথাও সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই আমরা পেয়েছি। কিরণশশীর মুখে প্রহসনকার যে ধরনের সংলাপ বসিয়েছেন, তাকে দিয়ে যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করিয়েছেন সবটাই পরিকল্পনা মারফিক এবং অনেকটাই রং চড়িয়ে বলা। সেই অতিরঞ্জনটুকু বাদ দিলে যে কয়েকটি উচিত কথা পাব, তাতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—খুব ভুল কি কিছু বলেছে কিরণশশী? যেমন শশিভূষণের কথার জবাবে সে বলে—

‘ড্রাম ব্রট আমি রব্বার নই যে, আমি প্রিজিনমেন্ট স্বীকার করবো।’<sup>১৪</sup>

শিক্ষিত হলে মেয়েরা শুধু ‘পুরুষালি’ আচরণ করবে না, তাদের সমস্ত দাবিদাওয়াও পুরুষের দাবিদাওয়ার মতোই অগ্রাধিকার পাবে—এমন একটি আশঙ্কা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীপক্ষের বরাবরই ছিল। *সমাজদীপিকা* র লেখাটিতে বলা হয়েছিল স্ত্রী পুরুষ দুজনে শিক্ষিত হলে মুশকিল, একজনকে ‘অশিক্ষিত’ থাকতেই হবে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই মেয়েদের শিক্ষার সংশ্রব ত্যাগ করতে হবে। *পাস করা মাগ* প্রহসনে দেখানো হল তেমন-তেমন ঘটলে অর্থাৎ মেয়েরা ‘শিক্ষিতা’ হয়ে ‘পুরুষালি’ আচরণ করলে কী অনিষ্ট ঘটতে পারে। লক্ষ করার মতো, উনিশ শতকের বাংলায় যেখানে স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যম প্রধানত বাংলা ভাষাই এবং ছেলেদের পাঠক্রমে অগ্রাধিকার পায় ইংরেজি, সেখানে কিরণশশী অনায়াসেই তার কথাবার্তায় বাংলার পাশাপাশি ইংরেজি শব্দ এবং বাক্যাংশ ব্যবহার করে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই কিরণশশীর মুখে বাংলা ইংরেজি মেশানো অদ্ভুত সব সংলাপ ব্যবহার করা হয়। তার প্রতিটি আচরণে যাতে প্রকাশ পায় সে আর ‘মেয়ে’ নেই, লেখাপড়া শিখে ‘মদা মেয়েমানুষ’ হয়ে উঠেছে।

একটা সীমা পর্যন্ত মেয়েদের ‘সদর’ যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষের লোকেরা ‘অন্দর’ এর ভিতটাকেই আরও পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলেন। রক্ষণশীল বিরুদ্ধপক্ষ বরাবরই বলে এসেছেন মেয়েদের জন্য রান্নাঘরের চার দেওয়ালই নিরাপদ। স্ত্রীশিক্ষা যখনই এর ব্যত্যয় ঘটাল অর্থাৎ মেয়েরা ‘সদর’ এ যাওয়া শুরু করল, তখনই তাঁরা

খড়াহস্ত হয়ে উঠলেন। স্ত্রীশিক্ষাকে কটাক্ষ করে যে সমস্ত প্রহসন লেখা হয়েছে, তার একটা মূল আক্রমণের জায়গা ছিল মেয়েদের ‘অন্দর’ থেকে ‘সদরে’ যাওয়া। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের ‘খণ্ডপ্রলয়’ প্রহসনে দেখানো হয়েছে শিক্ষিত তরুণবালার পরিণতি কত ‘ভয়ানক’ হতে পারে। এই তরুণালা সরাসরি ‘অন্দর’ থেকে ‘সদরে’ যাওয়ার কথা বলে এবং স্ত্রীস্বাধীনতাকে সে একভাবে উপভোগও করে—‘আমরা বড় মজা পেয়েছি।/ইম্যানসিপেশনের জোরে স্বাধীন হয়েছি।/... সেই সনে জেনানা সিস্টেম উঠিয়ে দিয়েছি।/অন্দরে বন্ধ কে করে, বেরিয়েছি সব সদরে...’।<sup>২৫</sup> ‘পাতিব্রত্যা’ নারীর প্রধান ধর্ম। তেমনটাই বলে আসছিলেন পক্ষ ও বিপক্ষদলের ভদ্রলোকরা। বিপক্ষ মত অনুযায়ী শিক্ষিত হলে মেয়েরা ‘পাতিব্রত্যা’ বিসর্জন দেবে, পক্ষমতে শিক্ষাই মেয়েদের আরও ভালোভাবে ‘পতিব্রতা’ করে তুলবে। কিরণের মুখে ‘পতিনিন্দা’ শুনে শশিভূষণের মনে হয়; ‘শিক্ষিতা স্ত্রী’ হিন্দুসমাজে কী দুরবস্থা হই না ডেকে আনতে পারে; তাই শশিভূষণের নির্দিষ্ট মন্তব্য—

হে হিন্দুভ্রাতাগণ! যদি মর্যাদা চাও, জাতি চাও, তবে যেন কেউ—পাস করা মাগ না চায়।<sup>২৬</sup>

কিরণশশী ‘বিবাহ’ প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলি তোলে, এর নিয়ম কানুনকে ‘ব্যাদরুল’ বলে উল্লেখ করে সেগুলি আজকের দিনে তেমন অনুচ্চারিত নয়। ‘শিক্ষা’ মেয়েদের দিয়ে যদি এমন সব কথা বলিয়ে নিতে পারে, তবে তার একটা ইতিবাচক দিক আছে। তাই কিরণশশীর প্রশ্নগুলিকে আজকের দিনে গুরুত্ব দিতে পারি। কিন্তু গুরুত্বটুকু সাময়িক। প্রহসনে শেষপর্যন্ত যে কিরণশশীকে আঁকা হল, তার পরিণতিকে যেভাবে তুলে ধরা হল, তাতে এই প্রশ্নগুলো সম্মান হারাল, কোনও ইতিবাচক দিক তৈরি করতে পারল না। স্ত্রী তার প্রয়োজনে স্বামী বদলাতে পারে সেই প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব হারাল। যদিও এমন ইতিবাচক দিককে তুলে ধরা এই প্রহসনের উদ্দেশ্যও ছিল না। স্ত্রীশিক্ষাকে কটাক্ষ করে লেখা প্রহসনগুলিতে মেয়েদের স্বেচ্ছাচারিতার কথাই কেবল বলা হয়নি, সঙ্গে এও বলা হয়েছে, যে বাড়ির মেয়েরা শিক্ষিত সে বাড়ির পুরুষরা স্ত্রেণ। ‘বেহদ বেহায়া’, ‘পণ্ডিত মেয়ে’, ‘কলির মেয়ে’, ‘স্বাধীন জেনানা’, ‘আকেল সেলামী’, ‘নব্যবাবু’, ‘মেয়ে মনস্টার মিটিং’, ‘মেয়েছেলের লেখাপড়া আপনা হতে ডুবে মরা’ ইত্যাদি কয়েকশো চটি বইতে একখাটা নামী অনামী লেখকরা বেশ উঁচু গলায় চাউর করেছিলেন, শিক্ষালাভ করে মেয়েরা কেবল ‘বিপথগামী’ হই হবে না, তারা ‘নব্যবাবু’ও হয়ে উঠবে, এ হল ঘোর কলি! অমৃতলাল বসুর ‘তাজ্জব ব্যাপার’ এ পুরুষরা থাকে বাড়িতে, ঘরকন্নার কাজ করে আর মেয়েরা যায় বাইরের কাজে—‘আমরা সব কলেজ যা’ব, নলেজ পা’ব,/টপ্পা গেয়ে করবো সুখে বাবুয়ানা;/এখন তোমরা কুটনো কোটো, বাটনা বাটো,/দাও লক্ষ্মীপুজোর আল্পনা।’<sup>২৭</sup> স্ত্রীশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত নয়, বিপক্ষদলের একখাটা বেশিদিন ধোপে টেকেনি, যুক্তির পালটা যুক্তি তৈরি করেছেন, তাতেও তাঁরা খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি। তাই শেষপর্যন্ত তাঁরা একথা বলতে লাগলেন স্ত্রীশিক্ষা সামাজিক বিধিসম্মত নয়, মেয়েরা শিক্ষিত হলে প্রচলিত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা উলেট যাবে। ‘অন্দরমহল’-‘বাহিরমহল’-এর ছকও যাবে বদলে।

পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমাজমন দীর্ঘদিন ধরে আত্মস্থ করেছে, কেবল পুরুষ নয়, মেয়েরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মূল্যবোধের বাইরে যেতে পারেনি, যেতে চায়ওনি অনেকসময়। মেয়েরা প্রচলিত সমাজকর্ণে কথা বলবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের জীবন অভিজ্ঞতা থেকে অনেক সময় প্রতিশোধের চেতনা তৈরি হতে পারে, যা তাদের জীবনযাপনের পরিপন্থী তাকেও প্রশ্ন করতে পারে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে লেখা এই ধরনের প্রহসনে শেষপর্যন্ত মেয়েদের তেমন কোনও প্রতিশোধের চেতনা গড়ে উঠল না। পাস করা মাগ প্রহসনে কিরণশশীর তিন নম্বর বিবাহ হয় হরিশবাবুর সঙ্গে। কিরণশশী সমাজ প্রচলিত নিয়মকে বদলে দিতে বন্ধ পরিকর। মেয়েরা আর বৈধব্য জ্বালা সহ্য করবে না, তা করবে পুরুষ। কিরণশশীদের তৈরি করা ‘পুরুষের বহুবিবাহ নিবারণী সভা’র ঘোষিত উদ্দেশ্য তেমনটাই। পুরুষ একাধিক বিবাহ করতে পারবে না, শুধু তাই নয়, স্ত্রীর অবর্তমানে তাকে বৈধব্য জ্বালাও সহ্য করতে হবে। অন্যদিকে মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর বা স্বামী বর্তমান থাকাকালীন ইচ্ছামতো ‘পতিত্যাগ’

## OPEN EYES

করে অন্য কাউকে বিবাহ করতে পারবে। এতদিন ধরে সমাজে যে নিয়ম-বিধি বলবৎ আছে তার পালটা নিয়ম চালু করতে চায় কিরণশশী। প্রচলিত সামাজিক বিধিকে সে শুধু মানে না তা নয়, সেই 'বিধি'র অস্তিত্বকেই সে মুছে দিতে চায়, সামাজিক মতাদর্শকে নতুন করে সে গড়ে পিটে নিতে চায়। সমাজ 'দ্বোজবরে পাত্র'কে মেনে নেয়, কিন্তু কিরণশশীর মতো 'তেজবরে মাগ'কে কি সহ্য করবে? তাই শুরু হয় প্রায়শ্চিত্তের পালা। 'খারাপ' মেয়েদের জন্য সমাজে দু'ধরনের পথ খোলা থাকে—এক, শোধনের; দুই, বহিষ্কারের। শোধনের একমাত্র উপায় প্রায়শ্চিত্ত। ছিন্ন গাউন, ছিন্ন সাজে কিরণশশী একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দেয়, সেই বক্তৃতা জুড়ে থাকে অনুশোচনা আর অনুতাপ। শাস্ত্রমতে শশীবাবুই তার 'ধর্মপতি', বাকি সবাই 'উপপতি'। বাপ মায়ের পয়সায় 'বিবিয়ানী' করে আজ তার এই অবস্থা। সতী সাবিত্রী, সীতার মতো সে 'আদর্শ' মেয়ের জীবন কাটায়নি। তাই আজ সে তার সকল স্বামীর সঙ্গে 'জন্মের শোধ দেখা করে এই পাষণ্ড প্রাণকে বিসর্জন' দেবে। তার দেহে একদিন যে 'টাদের কিরণ' ছিল আজ তা অবসিত, ভিক্ষে করে তার দিন চলে। সে দেখতে কী 'কুশ্রী'ই না হয়েছে।<sup>১৮</sup> এই বইয়ের প্রচ্ছদে (১৩০৯ এর নামপত্র) রয়েছে উল্লঙ্ঘ মেয়ের ছবি। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা 'লজ্জাহীনা' হয়ে পড়ে, একথাটা কেবল সাময়িকপত্রে প্রচার করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বইয়ের প্রচ্ছদেরও বিষয় হয়ে ওঠে। ছবিটি আমাদের কাছে এই প্রতিক্রিয়া পৌঁছে দেয়, লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা এমন 'নষ্ট', 'নির্লজ্জ' হয়ে পড়ে, যা দেখতে 'কুশ্রী'ই লাগে। এ শুধু দৈহিক 'কুশ্রী' নয়, মানসিকভাবে 'কুশ্রী'। সামাজিক লিঙ্গবৈষম্যের ধারণা কতভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এই ছবিটি।

স্বীশিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক রচনায় আমরা দেখেছি শিক্ষাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিপক্ষ দল যারপরনাই আজগুবি সব যুক্তি ফেঁদেছিলেন। যদিও তাকে কতটা 'যুক্তি' বলা যায় সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। অনেকসময়ই শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের শরীর-সংক্রান্ত প্রশ্নটি জুড়ে যাচ্ছিল, প্রাকৃতিক ও সামাজিক লিঙ্গরূপের ধারণাকে একীকৃত করে দেখা হচ্ছিল। লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের 'বক্ষদেশ' সমতল হয়ে যাবে, 'সন্তান উৎপাদনকারী' শক্তিগুলি বিনষ্ট হবে ইত্যাদি। পাস করা মাগ প্রহসনে একটি বাড়তি কথা বলা হল—লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা 'কুশ্রী' হয়ে যায়, যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে রূপটাও নষ্ট হয়ে যায়। কিরণশশীর ক্ষেত্রে তেমনটাই হয়েছে। সে 'খারাপ', 'মন্দ'—একথাটুকু বলাই প্রহসনকারের উদ্দেশ্য ছিল না। লেখাপড়া শেখার পরিণামে মেয়েরা যে 'খারাপ' এর শেষ পর্যায়ে পৌঁছোতে পারে সেটা প্রায় জোর করেই বলা হয় প্রহসনের শেষে এসে। কিরণশশীকে 'বেশ্যা' বলে শশিভূষণ। গোটা প্রহসনটি পড়তে পড়তে আমরা এটুকু বুঝি, শিক্ষিতা কিরণশশী পতিকে 'পায়ের তলে' রাখতে চায়, সমাজপ্রচলিত নিয়মবিধিকে সে অগ্রাহ্য করে, মেয়েদের জন্য এতদিন সমাজে যে রীতি নীতি আচার বিধি চালু ছিল তার বিলোপ ঘটিয়ে সে পালটা নিয়ম-বিধি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে এবং একাধিক বিবাহ করে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, পুরো লেখাটিই উদ্দেশ্যমূলক। কিন্তু কোথাও এই ইঙ্গিত থাকে না যে, কিরণশশী 'বেশ্যা'। বিশ জনের উপভোগ্য হওয়া আর একাধিকবার বিবাহ করা যে এক নয়, সেটা বলা বাহুল্য। প্রহসনকার কিরণশশীকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালেন, কিন্তু সমাজে নিলেন না। শোধনের পর বহিষ্কারই কিরণশশীর বিধিলিপি। এ এমনই এক ব্যবস্থা যেখানে 'পতিত'দের শোধনের ব্যবস্থা থাকলেও, কিরণশশীর মতো 'পতিত'দের জন্য একটাই পথ খোলা—সমাজ থেকে বহিষ্কার। স্বীশিক্ষা আন্দোলন একদিকে এই মতাদর্শকে স্থাপন ও পুনরুৎপাদন করেছে যে, 'পতিসেবা' ও 'পতির সন্তোষ উৎপাদন করা' মেয়ে জাতের সারধর্ম। তেমনি অন্যদিকে মেয়েদের মধ্যে এমন কতগুলো 'বিদ্রোহ'কেও চাগিয়ে তুলেছে যেখানে একজন মেয়ে শ্বশুরবাড়িকে 'গোরুর গোয়ালের বন্ধতা'র সঙ্গে তুলনা করতে পারে। 'যত কম জানে তত বেশি মানে', যখন থেকেই 'বেশি জানতে' শুরু করবে তখন থেকেই 'কম মানবে'। বেশি জানলে, কম মানবে—স্বীশিক্ষার বিপক্ষমত দাঁড়িয়ে রয়েছে এই আশঙ্কার উপর। এই আশঙ্কা নিরসন করতে, সমাজমনকে বশে আনতে তাই তাঁদের এমন 'যুক্তি' ও ফাঁদতে হয়, 'শিক্ষিতা' হলে মেয়েরা 'ব্যভিচারী' হয়ে পড়বে, 'বেশ্যা' হয়ে যাবে। তাই মেয়েদের লেখাপড়া শেখার দরকার নেই।

স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনের ‘আদর্শ’ ব্যবস্থা একদিকে যেমন সুশীলার মতো ‘লক্ষ্মী’দের তৈরি করেছিল তেমনি শিক্ষার কুফল হিসেবে সমাজ কিরণশীলদের মতো ‘অলক্ষ্মী’দের আচরণে ভয় পেয়ে তাদের একঘরে করেছিল। সামাজিক বিধিব্যবস্থা উলটে যাবার আশঙ্কা থেকেই শিক্ষার সঙ্গে ‘অলক্ষ্মী’দের একধরনের অনিবার্য যোগসূত্র স্থাপন করা হচ্ছিল।

কলকাতার ‘বাল্মীকি যন্ত্র’ এ ছাপা, ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত *সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়* বইটিতে বেশ কিছু মজার গল্প পাওয়া যায়। তেমনি একটি গল্প রয়েছে ‘স্ত্রী-তত্ত্ব’ নিয়ে। বঙ্গদেশ থেকে এক আবেদনপত্র বিধাতার কাছে আসে, পুরুষের বয়ানে স্ত্রীলোকের চরিত্রকথা সেই চিঠিতে লিপিবদ্ধ থাকে। সেখানে বলা হয় বঙ্গের স্ত্রীজাতি ‘শ্লেহ ও ভক্তিশূন্য; রক্ষনকার্য ও সন্তান প্রতিপালনে নিতান্ত অপটু’ এবং স্বামীর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর। অতীতে যুবতীরা ‘অসূর্যস্পর্শ্যা’ ছিলেন, কিন্তু আধুনিক মেয়েরা যায় না এমন স্থান নেই। মেয়েরা যে এমন ‘লজ্জাহীন’, ‘নীতিহীন’, ‘বেহন্দ’ হয়ে পড়েছে, তার কারণ নিয়মিত তাদের ‘নাটক-নভেল’ পাঠ, এরই মধ্যে যারা ‘বুদ্ধিমতী’ তারা আত্মরক্ষা করতে পেরেছে, তারা তাই ‘পতিকুলাবলম্বিনী’।<sup>১৮</sup> শিক্ষা মেয়েদের এত বড় ‘সর্বনাশ’ করেছে যে, ‘মর্ত্তলোকে’র সে খবর ‘সুরলোকে’ পৌঁছে যায় নিমেষে! ‘সুরলোক’-এর বিধাতার কাছে ‘মর্ত্তলোকে’র নরগণের একটাই প্রার্থনা—গৃহস্ত্রী আবার যেন গৃহস্ত্রী ফিরিয়ে আনে। স্ত্রীশিক্ষার পক্ষের লোকরা ‘ভালো’ মেয়েদের ভালোছকে আরও ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ‘খারাপ’ মেয়েদের উদাহরণ অনেক দিয়েছেন। আর বিপক্ষমতের একটা বড় অংশ জুড়েই ছিল শিক্ষার সঙ্গে ‘খারাপ’ মেয়েদের যোগ। দুপক্ষই দুভাবে শিক্ষার সঙ্গে মেয়েদের ‘খারাপ’ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। এই ‘খারাপ’ বা ‘মন্দ’ মেয়ে বলতে তাঁরা যাদের বোঝাতেন তার পরাকাষ্ঠায় রয়েছে ‘পতিতা’রা। ঘর ছেড়ে যে মেয়ে রাস্তায় নেমেছে, কুলত্যাগ করেছে, কিংবা কুলের মুখে কালি লেপে দিয়েছে, সমাজ তাকে বলবে ‘কুলটা’। ‘পতিতা’রাও এক অর্থে ‘কুলটা’। উনিশ শতকের স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ‘কুলবধু’দের নির্মাণের পাশাপাশি একভাবে ‘কুলটা’, ‘পতিতা’দেরও নির্মাণ করল।<sup>১৯</sup> এবার আমরা ফিরে যাব এই লেখার শিরোনামে। ‘গেরস্থর মেয়ে দিন রাত্তির অমন কাগজে কলমে থাকলে, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়’—রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কষ্টিপাথর* (১৮৯৭) প্রহসনে কবিতা লেখায় বাতিকগ্ৰস্ত নলিনীকে সংসারের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে এসে নলিনীর পিসি একথা বলেন।<sup>২০</sup> এমন কথা বলার কারণ লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা আর ‘লক্ষ্মীমন্ত’ থাকবে না, সংসার ‘অলক্ষ্মী’তে ছেয়ে যাবে। এই আশঙ্কা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীপক্ষের বরাবরই ছিল। মেয়েদের লেখাপড়া না শেখানোর অন্যতম প্রধান যুক্তিও ছিল এটি। স্ত্রীশিক্ষার সমর্থকরা বিরোধীপক্ষের মতকে একেবারে আমল দেননি, তেমনটি মনে করলে ভুল হবে। তাঁরাই শঙ্কিত হয়ে পড়েন এই ভেবে, ‘বিকৃত শিক্ষা’য় মেয়েরা ক্রমশই তাদের কর্তব্য থেকে চ্যুত হচ্ছে। তাদের মধ্যে ‘মেয়েলি’ গুণপনার অভাব দেখা দিচ্ছে। এই একটি জায়গায় এসে স্ত্রীশিক্ষার সমর্থক ও বিরোধীপক্ষের মত মিলে যায়। কেবল সাময়িকপত্রে বিতর্করচনা বা বঙ্গভাষানুবাদক সমাজে প্রকাশিত *গার্হস্থ্য বাঙ্গালা* পুস্তক সংগ্রহই নয়, স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে সমাজ মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ করলাম সে সময়ের প্রহসনগুলিতেও। এইভাবেই স্ত্রীশিক্ষার ভালো মন্দ সমাজে ‘লক্ষ্মী’ ‘অলক্ষ্মী’র আসনটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

## টীকা ও উল্লেখপঞ্জি

১. ‘স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী’, *সেকালের নারীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা* (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ) সম্পা. ভারতী রায় (কলকাতা : উইমেন স্টাডিজ্ রিসার্চ সেন্টার, ১৯৯৪), পৃ. ১৩৬।
২. ‘স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যিকতা’, তদেব, পৃ. ১৪১।
৩. ‘স্ত্রীবিদ্যা এবং চন্দ্রিকা’, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (দ্বিতীয় খণ্ড) সম্পা. বিনয় ঘোষ (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, এপ্রিল ২০১৫), পৃ. ৩২।
৪. ‘স্ত্রীশিক্ষা’, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (তৃতীয় খণ্ড) সম্পা. বিনয় ঘোষ (কলকাতা : প্রকাশ ভবন, নভেম্বর

## OPEN EYES

২০১৫), পৃ. ১০২।

১০. 'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা', সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড) সম্পা. স্বপন বসু (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩), পৃ. ৩৪৩-৩৫০।
১১. 'স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের ধর্মরক্ষা নিতান্ত দুর্ঘট। সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে যেরূপ পুরুষের মন বিচলিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বাধীনতা প্রাপ্ত স্ত্রীগণ সমাজে সুন্দর পুরুষ দর্শন করিলে তাহাদের অভিলাষিণী হইবে সন্দেহ নাই। .... এ অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হইলে কুপথগামিনী হইবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।'—'স্ত্রী স্বাধীনতা', এডুকেশন গেজেট, ২৩.৫.১৮৭৯।  
ন্যাশনাল পেপার-এ প্রকাশিত একটি খবর থেকে জানতে পারি সে সময়ে অনেকক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' ও 'সভ্যতা'কে 'সতীত্ব' এর পরিপন্থী বলে মনে করা হয়েছে—'According to the Banga Mohila, "Independence and civilization are enemies to female chastity. In Bengal there is little of either, they are chaste. Among the Koles and other wild tribes the women are more independent, but because uncivilized, they too are chaste.'"—National Paper, 13.7.1870.  
বসু, সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ৪০৩, ৩৯০।
১২. 'নারীধর্ম', সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ৩৬২।
১৩. 'স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্ম-শিক্ষার আবশ্যিকতা', সেকালের নারীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৪-৮৬।
১৪. 'স্ত্রীগণের ধর্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না?', সেকালের নারীশিক্ষা : বামাবোধিনী পত্রিকা (১২৭০-১৩২৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৩১-১৩২।
১৫. ১২৯৫ বঙ্গাব্দের পরিচারিকা পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'স্ত্রীলোকের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত?' নামে একটি লেখায় এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে।  
বসু, সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ৩৬২।
১৬. সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, 'মহিলা', অন্য কলকাতা, বিশ্বনাথ জোয়ারদার (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪), পৃ. ৮৩।
১৭. রাখাবিনোদ হালদার, 'পাস করা মাগ', প্রহসনে কলিকালের বঙ্গমহিলা (১৮৬০-১৯০৯) সংকলন ও সম্পাদনা হার্দিকব্রত বিশ্বাস (কলকাতা : চর্চাপদ, ২০১১), পৃ. ৩৬২।
১৮. জোয়ারদার, অন্য কলকাতা, পৃ. ৮৩।
১৯. '.... though *Strishiksha* was enabled by vernacularization of education, in Radhabinode Halder's *Pash Kara Maag*, the words and phrases freely jostle with Bengali. She dominates her hen-pecked husband who has been rendered meek, nervous and submissive by *Strishiksha*, for it makes women out of men ....'  
Tanika Sarkar, 'Strishiksha and its Terrors : Re-Reading Nineteenth-Century Debates on Reform,' *Literature and Gender ed. Supriya Chaudhuri et. al.* (Calcutta : Orient Longman, 2002), P. 178.
২০. বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, খণ্ড-প্রলয় (কলকাতা : শ্রী কুঞ্জবিহারী বসু কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩০০ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১।
২১. হালদার, পাস করা মাগ, পৃ. ৩৬৮।
২২. অমৃতলাল বসু, তাজুব ব্যাপার (কলকাতা : গ্রেট ইডিন্ প্রেস, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৫।
২৩. বই পড়ার মতো বই দেখার নেশা তৈরি হল উনিশ শতকে। এই নতুন নেশাকে অনেকটাই গড়ে তুলেছিল বটতলা। বটতলার বইয়ের অন্যতম আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে—ছাপা ছবি। বইয়ের প্রচ্ছদে থাকত দেবদেবীর ছবি কিংবা মানুষের ছবি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে মনুষ্য শরীরের প্রদর্শনই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়—ছবিকেও উপভোগ করা যায়, এমনটা আগে কল্পনাই করা যায়নি। বটতলার প্রহসনগুলির একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল মেয়েরা। মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীন জীবনযাপনকে ব্যঙ্গ করে অজস্র ছবি ছাপা হয়েছিল।
২৪. হরনাথ ভণ্ড, সুরলোকে বঙ্গের পরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) সম্পা. অলোক রায় (কলকাতা : গ্রন্থন, ১৯৭৬),



‘গেরহর সেরে দিন নাতির সময় কাপড়ে বনতে থাকতেন, নক্ষত্রী হেরে যায়’ উনিশ শতকের বাংলার ক্রীশিক্ষায় ‘শালক্ষ্মী’র নির্মাণ

পৃ. ৬৫-৬৬।

২০. Ratnabali Chatterjee, 'Prostitution in Nineteenth Century Bengal : Construction of Class and Gender', *Social Scientist* Vol. 21, Nos. 9-11 (Sept.-Nov, 1993), P. 163.
২১. রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই প্রহসনটি ১৩৯২ বঙ্গাব্দে *বিভাব* পত্রিকার বর্ষা সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়।  
রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কষ্টিপাথর’, *বিভাব* (বর্ষা ১৩৯২ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২১।

---

শাশ্বতী রায়

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,  
সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ (অটোনমাস), কলকাতা

## Anton Chekhov's *The Duel* and the Missing Pistol Shot

Subhadip Das

The silver screen has been kind to Chekhov. Perhaps the reason why Chekhov is so popular among filmmakers is the fact that short stories and plays closely approximate the run time of a feature or maybe even a short film. Chekhov's insistence on atmosphere, mood and psychological complexity in his characters plays out well with the format of cinema. His continuous hovering between subjectivity and objectivity makes Chekhov's stories a delight to be filmed. Geoffrey Wagner in his book *The Novel and The Cinema* speaks about commentary, analogy and transposition as three modes of adaptation. (Wagner 219-33) In this regard we might call the 2010 cinematic adaptation of Chekhov's *The Duel* as transposition, since the cinematic version is limited to deal with core narrative structure and action of the original work. The British critic David Lodge points out subtly to the merits and demerits of cinema :

Film creates an illusion of life... We are more likely to feel strong physical symptoms of pity, fear etc... the film is more like a record of something that happened, or is happening, only once. The camera and microphone are voyeuristic instruments: they spy on, eaves drop on experience and they can in effect follow the characters anywhere—out into the wilderness or into bed—without betraying their presence, so that nothing is easier for the film-maker than to create the illusion of reality. Of course, film is still the system of signs, a conventional language that has to be learned (films are more or less unintelligible to primitive people never exposed to them before). The oblong frame around the image does not correspond to the field of human vision and the repertoire of cinematic shots—long shot, close-up, wide-angle, etc.—bears only a schematic resemblance to human optics. Nevertheless, once the language of the film has been acquired it seems natural: hence the thudding hearts, the moist eyes, in the stalls. We tend to take the camera eye for granted, and to accept the 'truth' of what it shows us even though its perspective is never exactly the same as human vision... film does not deal very much or very effectively with consciousness except insofar as it is manifested in behavior and speech, or can be reflected in landscape through the pathetic fallacy, or suggested by music on the soundtrack. (Lodge 104-5)

During the first half of the 19<sup>th</sup> century two practices became a sort of cultural institution in Tsarist Russia: Dueling and Suicide. A history of suicide in Russia and its consequences would be beyond the scope of this paper. However, dueling became a source of great attraction during this period. If we look at the history, some of the most important personalities throughout history have been charmed by dueling – from Ben Jonson to Caravaggio. It would be interesting

---

Das, Subhadip : Anton Chekhov's *The Duel* and the Missing Pistol Shot

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 52-57, ISSN 2249-4332

to note in this regard that two of Russia's premier writers were killed in dueling: Alexander Pushkin in 1837 and Mikhail Lermontov in 1841. Western filmmaking has had its own share of fan following with the aspect of dueling. It is worth noting here that both Steven Spielberg's and Sir Ridley Scott's debut movie deal with dueling. Spielberg's *The Duel* (1971) deals with a vengeful tanker truck driver out to kill a salesman in a road rage. Scott's movie *The Duellists* (1977) deals with two French soldiers out to kill one another as a matter of honor. It is noteworthy here that the cinematic version of Chekhov's *The Duel* which was released in 2010 is particularly interesting because Andrew Scott (better known to us as Moriarty from the BBC TV Series *Sherlock*) essaying the role of Laevsky. H. Peter Stowell claims the film as, "the finest adaptation of Chekhov's prose because without sacrificing cinematic integrity it captures the essence of his bittersweet mood, complex dramatic structure, and nuances of characterization." (Stowell 286) The director Dover Kosashvili has placed particular importance on the *mis en scene*,<sup>1</sup> especially the setting and the lightning. The setting is an unnamed Black Sea port, with sensuality and languor dominating. The high key lightning is generally used when characters are outdoor, however when the characters are left all by themselves in their rooms—a particularly low-key lightning is used.

In Chekhov's novella the question of dueling does not arise until more than half the novella is finished. The proposal of duel arises suddenly when Laevsky and von Koren decide they need to settle their ideological differences via a gunfight. For both of them this would be their first duel. However, in the cinematic adaptation we are shown that von Koren is practicing target shooting before the dueling episode comes up. The protagonist of the novella, Laevsky, is bored with his mistress Nadezhda Fyodorovna and wants to escape from her. He has broken up her marriage, thereafter eloping with her from St. Petersburg and has settled in an unnamed black sea port, but now he wants to escape. Almost the entire plot consists of Laevsky's coming to terms with himself—about his guilt at the thought of abandoning his helpless mistress. The film tries to portray this sense of helplessness on the part of Laevsky by showing him attempting a molestation of Nadezhda. (This episode however is completely absent in the novella). Perhaps the only saving grace in Laevsky's character is his ability to forgive Nadezhda even after finding her in flagrante delicto. It is perhaps this forgiveness that makes Chekhov save Laevsky from an almost a certain death during the duel next day. In the novella when the duel begins, we find Laevsky is scared, the deacon comments that he looks "like an old man" (Chekhov, *The Duel* 222); Laevsky does not want to continue with the duel and apologizes to von Koren. Koren would have none of it, he wants to fight. In a typical Chekhovian twist we find none of them know the rules of dueling, "Gentleman, who remembers how it is described in Lermontov? von Koren asked, laughing. "In Turgenev, too, Bazarov exchanged shots with somebody or the other ..." (227) Laevsky fired a blank shot in the air. However, when it was Koren's time to shoot he thought that, "Now I'll kill him," thought von Koren, aiming at the forehead and already feeling the trigger with his finger. "Yes of course, I'll kill him ..." (228) As he was about to fire a desperate cry rang out, "He'll kill him!"

## OPEN EYES

(228). The shout distracted von Koren and he missed his shot. It was his friend the deacon who had shouted out! (earlier in the story as well as the film it was shown that the deacon had decided not to witness the duel as he was a man of God and would not be a witness to bloodshed. However, curiosity got the better of him.) Now the movie also portrays this missed shot. But the outcome is quite discounted in the movie. Chekhov in his stories and his plays refrained from showing violence. (a notable exception would be the short story *Sleepy* where the young girl strangles the baby just to get some sleep). In Chekhov's *Three Sisters* we have the fatal duel between Solyony and Tuzenback, but the duel takes place offstage and its consequences is reported later on. Similarly, in *The Seagull* the suicide of Trepliov occurs offstage. Dostoevsky's *The Possessed* (also known as *The Devils*) published exactly twenty years before Chekhov's *The Duel* also portrays such a duel, with similar results. (No party is injured). We might compare Dostoevsky's description of the morning of the duel with Chekhov's description. Dostoevsky describes the morning, "The rain of the previous night was over, but it was wet, damp and windy. Low, ragged, sooty clouds scudded across the cold sky; the tree-tops rustled intermittently in the gusts of wind and creaked on their roots; it was a melancholy morning." (Dostoevsky 288-89) Chekhov in his story narrates that: "Dawn was breaking. The gray, dull morning, and the clouds racing westward to catch up with the thunderhead, and the mountains girded with mist, and the wet trees—it all seemed ugly and angry to the deacon." (Chekhov 220) In the movie however the weather is shown to be exceptionally fine, with bright sunlight and birds chirping. Dostoevsky's *The Possessed* was adapted for the screen by the Polish director Andrzej Wajda. In the movie *Les Possessed* (1988), Wajda completely does away with the duel episode instead focusing on the killing of Shatov, the suicide of Kirilov and the death of Peter Verkhovensky (played by Omar Sharif). It would do us good to dwell for some time in the duel depicted in Dostoevsky's *Possessed* whose beginning and end closely echoes Chekhov's story. The duel between Stavrogin and Gaganov begins with the same formalities as in Chekhov. Both participants are advised to reconsider their decision and give up dueling. Gaganov (like von Koren in Chekhov's story) refuses. The duel in Dostoevsky's novel is long and arduous as opposed to Chekhov's story:

At the word three, the combatants began walking towards each other. Gaganov at once raised his pistol and fired at the fifth and sixth step. He stopped for a second and, having made sure he had missed his opponent, quickly walked up to the barrier. Stavrogin, too, walked up to it, raised his pistol, but, holding it rather high, fired without taking aim at all . . . Kirilov at once declared that, if the opponents were not satisfied, the duel would go on. (Dostoevsky 292)

The duel does go on, with Gaganov managing to pierce Stavrogin's hat, a couple of inches lower and Stavrogin's life would have been cut short. However, when it was Stavrogin's turn to shoot, Dostoevsky describes the scene, "Stavrogin gave a start, glanced at Gaganov, turned away and without caring this time for his opponent's feelings, fired into the copse. The

Anton Chekhov's *The Duel* and the Missing Pistol Shot duel was over. Gaganov stood as though he had been crushed." (294) The similarities with this dueling episode and Chekhov's story abound: one of the two parties unwilling to continue with the duel, the bleak weather, the purposely missed pistol shot and so on and so forth.<sup>2</sup> Like Dover Kosashvili, the director of Chekhov's *Duel*, the Polish director Andrzej Wajda placed great importance on the *mis en scene* in his cinematic adaptation of Dostoevsky's novel. The color palette of the entire movie has dull and greyish tones, setting up a gloomy and foreboding atmosphere from the arrival of Stavrogin in Russia right up to the end.

It is of little doubt that director Dover Kosashvili has taken a few liberties with Chekhov's text while adapting it into the cinematic version. For example Laevsky is shown polishing his shoes after a passionate encounter with Nadezdha, Nadezdha talking in her sleep, and most importantly doing away with the torrential rain when von Koren departs. By eliminating the rain and portraying a calm atmosphere at the end of the movie, the director might have just missed an important aspect of Chekhov – the spirit of human triumph amidst hostility of nature. Chekhov wonderfully describes the atmosphere when von Koren departs:

The boat goes on and on, now it can no longer be seen, and in half an hour the oarsman will clearly see the steamer's lights, and in an hour they'll already be by the steamer's ladder. So it is in life... in search of the truth, people make two steps forward and one step back. Sufferings, mistakes, and the tedium of life throw them back, but the thirst for truth and a stubborn will drive them on and on. And who knows? Maybe they'll row their way to the real truth... It began to drizzle. (Chekhov 237)

Again another improvisation on the part of director consists in setting up the scene of the duel: he selects a cavern like place as the spot where the two main characters would duel, and this cavern is by the side of a small stream. In the text neither the cavern nor the stream is mentioned. Alexander Pushkin in his story *The Shot* (published in 1831, exactly six years before Pushkin's own death in dueling) also shows us a duel which ends inconclusively. *The Shot* is a story of waiting, the story of Silvio who wants to shoot the count, but in his own terms, he would duel with the count only when the count would value his own life and not under earlier circumstances when the count was reckless and was willing to throw away his life for a trifle. Just like the deacon in Chekhov's story, a timely intervention by Masha, the count's wife, saves his life. Silvio spares him with the parting words, "I am satisfied: I have seen your confusion, your dismay." (Pushkin 358). However, the difference between this story and Chekhov's is the fact that both the count and Silvio are experienced duelists unlike Lavesky and von Koren. In Sir Ridley Scott's debut film *The Duellists* (1977) two French soldiers fight each other out throughout the Napoleonic campaigns and thereafter. The film is an adaptation of Joseph Conrad's 1908 story *The Duel*. Feraud and D'Hubert continue their duel for almost fourteen years, on horseback, foot, pistol, swords. D'Hubert finally emerges victorious when he makes Feraud shoot twice, but himself refraining and thereby preserving the right to shoot twice anytime according to the laws of dueling. The plot of story has a striking similarity with Pushkin's story *The Shot*, as both stories end with no fatality at the end.

## OPEN EYES

To conclude, we may say, that the 2010 movie on Chekhov's *The Duel* is crafted wonderfully to show us not only the beauty of Russian landscape but also the obsession with dueling which characterized much of the 19<sup>th</sup> century Russia. Chekhov did not believe in violence, he perhaps believed that death benefitted nobody, especially dying with meaningless bravado at dueling. He seems to tell us that no one will remember our acts of bravery. In an interesting entry in his notebook Chekhov writes: "Looking out the window at the corpse which is being borne to the cemetery: You are dead, you are being carried to the cemetery and I will go and have my breakfast." (*Notebook* 104)

## Works Cited

- Chekhov, Anton. "The Duel." *The Complete Short Novels*. Translated by R. Pevear and Larissa Volokhonsky. Vintage, 2007.
- , "Sleepy". *The Steppe and Other Stories*. Translated by Constance Garnett. Everyman, 1991.
- , "Three Sisters". *Anton Chekhov's Plays*. Translated by Eugene k. Bristow. Norton, 1977.
- , "The Seagull". *Anton Chekhov's Plays*. Translated by Eugene k. Bristow. Norton, 1977.
- , *Notebook of Anton Chekhov*. B.W Huebsch, 1921.
- Conrad, Joseph. *The Duel*. Melville House Publishing, 2011.
- Duel*. Directed by Steven Spielberg, performances by Dennis Weaver and Carey Loftin, Universal Pictures, 1971.
- Dostoevsky, Fyodor. *The Devils*. Translated by David Magarshack. Penguin, 1953.
- Lodge, David. *The Modes of Modern Writing*. Bloomsbury, 2015.
- Maupassant, Guy De. "A Duel". *Selected Works*. Translated by Sandra Smith. Norton, 2017.
- Pushkin, Alexander. "The Shot." *Novels, Tales, Journeys: The Complete Prose of Alexander Pushkin*. Translated by R. Pevear and Larissa Volokhonsky. Knopf, 2016.
- Henderson, Brain. "The Long Take." *Movies and Methods: Vol I*, edited by Bill Nichols, University of California Press, 1979.
- Stowell, Peter H. "Chekhov into Film". *A Chekhov Companion*, edited by Toby W. Clyman, Greenwood, 1985.
- The Duel*. Directed by Dover Kosashvili, performances by Andrew Scott and Fiona Glascott, High Line Productions, 2010.
- The Duellists*. Directed by Ridley Scott, performances by Harvey Keitel and Keith Carradine, Paramount Pictures, 1977.
- Les Possedes*. Directed by Andrzej Wajda, performances by Lambert Wilson and Omar Sharif, Gaumont, 1988.
- Wagner, Geoffrey. *The Novel and The Cinema*. Associated University Press, 1975.

**(Footnotes)**

1. Brian Henderson talks about the *mis en scene* as a term that “is originally a theatrical one meaning literally (to) put in place. It is, baldly, the art of the image itself –the actors, sets and backgrounds, lightning, and camera movements considered in relation to themselves and to each other.” (Henderson 315) H. Peter Stowell believes that, “the concept of *mis en scene* which is so important to film signification is, of course, a theatrical term. Those elements covered by this term –setting, lightning, costuming, and actor’s behavior and movement.” (Stowell 241)
2. While this paper engages texts where the duels fought have yielded no result, it would be of some importance to turn to a story where a duel resulted in death. In 1883, Guy De Maupassant published a story titled *A Duel*. In it Maupassant narrates the story of a civilian Monsieur Dubuis who engages in a pistol duel with a Prussian army officer (the setting of the story is the German occupation of France, as an aftermath of the Franco-Prussian War) killing him. Maupassant describes the scene of the duel, “A voice shouted: Fire! Without hesitating, Monsieur Dubuis fired blindly and was astonished to see the Prussian opposite him sway, fling his arms in the air and fall facedown onto the ground. He had killed him.” (Maupassant 176). Like Laevsky in Chekhov’s story, Dubuis too had no previous experience of dueling. As Maupassant mentions, “Monsieur Dubuis had never held a pistol in his life.” (176)

---

*Subhadip Das*  
*Assistant Professor, Dept. of English*  
*Govt. General Degree College. Muragachha*

## **Socio-economic Implications of Shakespearean Gravediggers in the Context of a Global Pandemic**

**Sayantani Ghosh**

### **Abstract :-**

The main impetus behind William Shakespeare's creative acumen was to entertain the Elizabethan audience so that they frequented the Globe Theatre to watch his plays. It was more for financial profits than towards futuristic application or relevance that he poured his heart out in his writings. Yet in the present global pandemic scenario, we are left awestruck at the truth that lies embedded in Shakespeare's dialogues and how closely they deal with individual sentimentality and experience. Act V Scene I of 'Hamlet', popularly known as the gravediggers' scene, is all about looking at death from a casual, matter-of-fact angle. "He that is not guilty of his own death shortens not his own life." As the world today grieves and mourns the death of countless COVID-19 victims and watches people lose their battle against this fatal disease, Hamlet's words, before he jumps into the grave that was meant for Ophelia, wring at so many hearts. "What is he whose grief Bears such an emphasis, whose phrase of sorrow Conjures the wandering stars, and makes them stand Like wonder-wounded hearers?" In most of the movie adaptations of Hamlet, the role of the first gravedigger, who is a clown, has been played by extremely established actors because it needs a lot of expertise to play a Shakespearean clown and usher in the much-needed comic relief in a graveyard amidst all the hatred, murder, revenge and death. Shakespeare has so subtly brought out the class divide prevalent in his times and little has changed in the social-economic situation at present. The gravedigger's words ring so true when he says, "If this had not been a gentlewoman, she should have been buried out o' Christian burial." Laws were bent then, and laws are bent now to accommodate the rich and influential who get the best medical treatment in the best hospitals, while the poor are left to die. It is a pity that the world has not changed at all in these almost four hundred and twenty odd years.

*Keywords* : Gravediggers, COVID-19 Victims, Pandemic, Comic Relief, Class Divide

---

Ghosh, Sayantani : Socio-economic Implications of Shakespearean Gravediggers in the Context of a Global Pandemic

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 58-64, ISSN 2249-4332



**Introduction :-**

Considering the underlying the Socio-Economic context of the gravediggers' scene in the paradigm of the present global pandemic, the first image that comes to mind is that of a young distraught Prince standing in the graveyard holding a skull in his hand. It is the skull of Yorick, a former jester in the court of Hamlet's late father. The visual impact of this psychologically distraught Prince is both immediate and long-lasting (Frye 16). To summarize, this is an iconic image representing the inevitability of death and the existential meaninglessness of life in this context, that has for a long time, haunted Shakespeare's audience- both at the Globe Theatre in the 17th century and through all the following centuries.

**DEATH IN ITS DIFFERENT AVATARS**

Death is a recurrent feature in the Shakespearean tragedy 'Hamlet' (Shakespeare). Its merry dance continues to "entertain" us throughout the play to culminate in Ophelia's grave (Rutter 300). Today the Scene I of Act V of Shakespeare's tragedy 'Hamlet' has once again become horrifyingly relevant as the entire world grapples in the throes of a global pandemic. It has shaken the very foundation of humanity. In the present day, Death has not appeared as a hooded figure in a cloak carrying a scythe, but as an invisible minuscule virus, but it is also enjoying its merry dance, performing Shiva's dance and leaving the world devastated.

In the Elizabethan times, a person who committed suicide was denied a Christian burial. As a result, the gravedigger finds it very strange and questions:

"Is she to be buried in Christian burial when  
she willfully seeks for own salvation?" (Shakespeare 185)

Today due to the unbelievable number of deaths from the dreaded Covid-19, the victims are also deprived of a decent burial in the presence of family and friends. It has stripped people of their personalities, their entities, their human dignity, dreams and annihilated all that they were their very identity when they were alive. The Shakespearean groundlings- those who were not able to afford a seat in the Globe Theatre and watched it standing, found a reflection of their own thoughts in Argal's words when he says:

"If this had not been a gentlewoman, she should  
have been buried out o' Christian burial." (Shakespeare 186)

The aristocrats have always been served a better fortune than the commoners and even in Death, there were no exceptions. Rules have always been made to be broken but

## OPEN EYES

history abounds in instances of the law being made to bend to accommodate the rich. The same phenomenon has again reared its ugly head up. As the entire human race today is fighting tooth and nail against a global pandemic, Shakespeare's 'Hamlet' has once again brought to the forefront the economic aspect that there has always been, and always will be, a great class divide in society.

## GRAVEDIGGERS AS CLOWNS

The gravediggers (or Clowns) are examples of Shakespearean fools (also known as clowns or jesters). Like most Shakespearean fools, the Gravediggers are peasants or commoners who "possess an intuitive wisdom by virtue of their special affinity to nature" (Hunt 142) and use this great wit and intellect to get the better of their superiors, other people of higher social status, and each other. They appear briefly in Shakespeare's tragedy 'Hamlet', making their only appearance at the beginning of Act V Scene I (but they leave an indelible mark on the audience). They are first encountered as they are digging a grave for the newly deceased Ophelia, discussing whether she deserves a Christian burial after having killed herself.

In course of the scene, the First Gravedigger throws a skull and later again a second up and out of the grave. Hamlet points out to Horatio how inappropriate it is to treat what used to be someone's and possibly an important someone's body with such disrespect. They speak in riddles and witty banter regarding death and sing too (Hunt 143). They bring the focus to the real world of the audience. The literal greatness of the situation (the funeral) subsides to the humour. This makes it possible for the characters to look at the subject of death objectively, giving rise to Hamlet's musings over the skull of Yorick. Though the clown added some merriment to an otherwise serious situation, in this scene their words of mirth do seem strange because they are laid in a cemetery among the bones of the dead. In writing Hamlet, Shakespeare was preoccupied with the corruption of mortal flesh. From the famous first statement of the idea in Marcellus' "Something is rotten in the state of Denmark" to Hamlet's discourse with the Gravediggers on the lamentable condition of the bodies they disinter, the reader of the play may never long forget that after death the human body putrefies. To Shakespeare's contemporaries, of course, the idea was the most familiar of commonplaces, the center of a cluster of time-worn platitudes which, by making pious capital of a universal biological process, reminded man that flesh was foul and that even a king could go a progress through the guts of a beggar. It was a commonplace, but much more. Every Elizabethan citizen knew from personal observation the reek of a gangrenous wound or a cancerous sore (Altick 167)

Death has always been a mystery, and it has also been the predominant theme of discourse among writers, philosophers and sages. It is still not clear to us why no traveler has never returned to enlighten us about life after death. Human beings have time and again made numerous surmises and they differ on the basis of culture, time, place and ideology. In the midst of this absolute ignorance, the one and only absolute truth is that death is inevitable and will certainly visit us someday. It fills our hearts with fear and dread. Yet in the present pandemic situation, this fear has magnified manifold times, leaving human beings in a state of panic and despair. Covid-19 is another name for Death- a painful, suffocating and isolated from everything that we hold dear and shunned by all. It has become a crime to be inflicted by this disease.

Shakespeare's tragedies actually seem to revolve around Death, and it is as if they rush headlong towards it. The readiness is all that is required. 'Hamlet' has always been a treasure trove for research analysts but the situation today has added a previously unforeseen dimension to it, which is the basis of this research. Disaster, devastation, and death from the three pillars on which a tragedy is based and these very three pillars have become the basis of our lives today in this pandemic era.

#### REAL LIFE GRAVEDIGGERS

Death has not fazed gravedigger, Mohammed Shamim ever before, but since the grip of the coronavirus crisis as tightened in many places, a shiver runs down even his spine each time he sees a hearse pull up at the cemetery he tends: "I have always felt the safest around the dead and most vulnerable in the outside world. Now I find it difficult to sleep at night" Shamim says. He fears for his very life<sup>1</sup>.

In the present situation, the gravediggers are facing a precarious situation. The COVID-19 outbreak is giving them sleepless nights as they now fear the risk of coronavirus contraction. The burial grounds, too, have space crunch. The burial procedure is too risky as they now need to dig not four, but nine-foot deep pits for Covid cases. It is difficult to get down into this deep pit carrying the body. It is too risky. Relatives either do not come or even if they do accompany the corpse, they do not lend a helping hand. They are merely mute spectators<sup>2</sup>.

James Alan Gomes, a resident of Sao Paulo, Brazil, has been working as a gravedigger for over five years, a profession which is often met with prejudice. "There are people today who appreciate our work, but there are others who avoid getting close to us because they think we're infected" he says, commenting on the increase in burials due to Covid-19. Along with the prejudice, the amount of work has also been an extra challenge. Gomes remarked, "We have always had a hectic schedule, but with Covid-19, it has intensified." On top of

## OPEN EYES

everything else, the risks of his work cause even more fear. “No matter how much we use Personal Protective Equipment [P.P.E], with a single oversight we can get infected,” Gomes lamented<sup>3</sup>.

## COVID-19: THE MODERN PANDEMIC

*The pandemic has already taken thousands of lives and it is moving steadily and with haste to satiate its hunger. The tragedy is that no cure has been discovered yet. The images of masses of dead bodies in coffins from Italy and Spain are enough to send chills down one's spine. However, little thought is spared for those who work day and night to provide a proper funeral to those piles of dead bodies. No doubt, health workers, along with policemen, are providing their services for humankind, but aren't the services of these funeral workers also crucial? Narratives of people of all shades of lives, their pain and anxieties, because of the lockdown, have been shared throughout the pandemic. But nobody pays much heed to the funeral workers<sup>4</sup>.*

Death had not fazed Delver and Argal, the two gravediggers in Act V Scene I of ‘Hamlet’. The first clown, Delver, sings without a care as he digs a fresh grave (Patrick 25). The subject-matter of his merry song is definitely not in keeping with the solemn situation in which he is singing. Seeing the old man’s grim occupation and hearing his humorous song, the incongruity of the proceeding surprises the Prince who enquires of his friend:

“Has this fellow no feeling of his business that he sings at grave-making?” (Shakespeare 189)

To this query, Horatio sagely replies,

“Custom hath made it in him a property of easiness.” (Shakespeare 189)

It is from this feeling of absolute coziness and easiness that people have been ruthlessly wrenched out and made to confront the horrors of the post-pandemic world. In Shakespeare’s ‘Hamlet’, Ophelia’s coffin is brought to the burial ground by all her relatives, friends, mourners, priests and a procession headed by the royalty and their trains to bid her a befitting goodbye (Berry 26). As both Ophelia’s brother, Laertes and her lover, Hamlet jump into the grave and grapple with each other as proof of the intensity of the grief, we cannot but ponder over the sea-change that has taken place today. Close relatives too are not allowed a last look at their dear departed. They are deprived of giving vent to their feelings of grief and despair.

The socio-economic class divide, which is an integral part of any thriving society becomes apparent in the 21st century, post-Covid period too. The rich and the influential are able to accompany the mortal remains of their relatives on its last journey albeit at the necessary down payment of a hefty amount of money. This great divide transcends all times, places and pandemics (Watson 836). The current coronavirus pandemic is more than just a health

*Socio-economic Implications of Shakespearean Gravediggers in the Context of a Global Pandemic* emergency all over the world. As on one hand, when it had sent shock waves of pain, grief and death, on the other, the pandemic had further broadened the massive inequalities that already existed in society. Marginalised sections of the society have been the easiest prey for this virus, as most of them were already victims of social differentiation and discrimination. The unheard plight of funeral workers is a no different, as they often go ‘missing’ from the eye of the general public. Funeral workers all over the world, irrespective of whether they are grave diggers or cremators, perform their duties to provide a dignified funeral to our loved ones<sup>5</sup>. The gravediggers’ scene in ‘Hamlet’ was intended primarily for comic relief but it has effectively contributed more towards heightening the tragedy in the life of the young Prince and increasing the atmosphere of sadness and grief (Nasic 33). Hamlet’s appearance, thoughts, feelings, and actions- all demonstrate his obsession with depression and death. Like Hamlet today we too have been trampled over by depression and the heart-wrenching news of the death of our near ones. The global figure of those already dead and infected pushes us further into the world of despair and gloom from which we find no means of escape. The scene is not one of comic relief for us.

## CONCLUSION

In the post-pandemic world, where things are bound to change, Shakespeare remains enormously relevant and topical. Altogether Shakespeare’s works include 38 plays, 2 narrative poems, 154 sonnets, and a variety of other poems, no original manuscripts of Shakespeare’s plays are known to exist today. It is thanks to a group of actors from Shakespeare’s company that about half the plays have been recovered. They collected them for publication after Shakespeare died, preserving the plays. These writings were brought together in the First Folio (‘Folio’ refers to the size of the paper used). It contained 36 of his plays, but none of his poetry (Orgel 5). Shakespeare’s legacy is as rich and diverse as his work; his plays have spawned countless adaptations across multiple genres and cultures. His plays have had an enduring presence on stage and film. His writings have been compiled in various iterations of The Complete Works of William Shakespeare, which include all of his plays, sonnets, and other poems<sup>6</sup>. William Shakespeare continues to be one of the most important literary figures of the English language.

## Works Cited

- Altick, Richard D. “Hamlet and the Odor of Mortality.” *Shakespeare Quarterly* 5.2 (1954): 167-176.
- Berry, Philippa. *Shakespeare’s Feminine Endings: Disfiguring Death in the Tragedies*. Psychology Press, 1999.

## OPEN EYES

- Frye, Roland Mushat. "Ladies, Gentlemen, and Skulls: Hamlet and the Iconographic Traditions." *Shakespeare Quarterly* 30.1 (1979): 15-28.
- Hunt, Maurice. "Hamlet, the Gravedigger, and Indecorous Decorum." *College Literature* 11.2 (1984): 141-150.
- Nason, Arthur Huntington. "Shakespeare's use of comedy in tragedy." *The Sewanee Review* 14.1 (1906): 28-37.
- Orgel, Stephen. "The Authentic Shakespeare." *Representations* 21 (1988): 1-25.
- Patrick, Jonny. "The busiest man in Denmark: Jonny Patrick looks closely at the gravedigger in Hamlet, Act 5 Scene 1." *The English Review* 21.3 (2011): 24-27.
- Rutter, Carol Chillington. "Snatched Bodies: Ophelia in the grave." *Shakespeare Quarterly* 49.3 (1998): 299-319.
- Shakespeare, William. *The tragedy of Hamlet*. Cambridge University Press, 1909.
- Watson, Marlene F., et al. "COVID 19 interconnectedness: Health inequity, the climate crisis, and collective trauma." *Family Process* (2020).

## Footnotes

1. <https://www.deccanherald.com/national/north-and-central/coronavirus-pandemic-dead-give-this-new-delhi-gravedigger-sleepless-nights-839010.html>
2. <https://www.theweek.in/news/india/2020/06/16/no-dignity-even-in-death-for-mumbai-s-covid-19-victims.html>
3. <https://globalvoices.org/2020/09/09/during-the-covid-19-pandemic-brazilian-gravediggers-face-increased-prejudice/>
4. <https://studentstruggle.in/unheard-plight-of-funeral-workers-in-the-time-of-covid-19/>
5. <https://studentstruggle.in/unheard-plight-of-funeral-workers-in-the-time-of-covid-19/>
6. <https://www.shakespeare.org.uk/explore-shakespeare/shakespeadia/william-shakespeare/william-shakespeare-biography/>

---

*Sayantani Ghosh*  
*Assistant Professor,*  
*Department of Communicative English,*  
*St. Xavier's College (Autonomous), Kolkata*

# **Cost Structure and Profitability of Major Crops Produced in West Bengal in the First Two Decades of the New Millennium :**

**A review**

**Hemanta Sarkar**

## **Abstract**

*Agriculture in West Bengal like all other states of India has been the mainstay of livelihood in all these years of planned economic development. Ensuring sustainable income from farming requires reasonable profit from cultivation and for that efficient cost effective as well as yield enhancing agricultural practices are needed to be adopted by the farmers. Data on Cost of cultivation/production and related data as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India in the period from 2001-02 to 2018-19 shows that profit generated from farming of the major crops of West Bengal has declined in the 2<sup>nd</sup> decade as compared to that achieved in the first decade of the new millennium. When measured over the catch-all cost (considering imputed value of family labour, imputed land rent on owned land and interest on fixed capital with the cost of agricultural inputs), majority of the major crops yielded negative returns to the farmers and failed to cover the cost of production. But farmers are ignorant about the distinction in the cost definitions and see profit from crop farming only over the paid-out expenses on inputs. In the current paper, attempt has been made to analyse the cost structure in producing major crops of West Bengal in the period from 2000-01 to 2018-19 after diving the period into two phases and the change in the dynamics of cost components over the two decades. Detailed discussion has been made in the paper on the profitability of the major crops on the basis of both the two alternative cost definitions as stated herein above which can shed light on how farmers get deprived of a decent farming income due to their wrong choice of crops and their calculation of profit based on an erroneous cost definition. To ensure sustainable farm income to the farmers of the state, Govts. at central or State levels should work together in making the farmers aware of the cost concepts, encourage them to adopt cost effective agricultural techniques and also to work on stabilizing input prices particularly the cost of fertilizer and irrigation (happened to be the two most important factors in negatively affecting farmers' income during the period of study as revealed by the panel regression exercise done in the paper).*

---

Sarkar, Hemanta : Cost Structure and Profitability of Major Crops Produced in West Bengal in the First Two Decades of the New Millennium : A review

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 65-84, ISSN 2249-4332

## **I. Introduction**

Agriculture in West Bengal in the 71 year period of planned economic development in India has been the largest employer of its population with a declining share in the GSDP notwithstanding the broad trend in the country. Share of agriculture in GSDP of West Bengal has fallen from 30.06% in 1980-81 to 21% in 2019-20 whereas share of agriculture in the state employment has gone up from 35.3% in 2017-18 to 36.1% in 2018-19 (State finance of West Bengal, December, 2017 and Govt. of India, MOSPI, July, 2020)

Agriculture being the largest sector for employing rural population in West Bengal as well as in India, issues related to the sustainability of agricultural activities in the state judged on the basis of potential of agriculture in the state translated through the aspects on productivity, cost of production and profitability in agriculture needs sincere and credible discussion. At the micro level when individual farmers need to understand the economics of cultivation (cost and returns) in respect of production of various crops to decide on the allocation of resources, state needs information on the crop wise cost patterns and returns thereof for taking important policy decisions, be it issues related to minimum support price of various crops or quantum of state procurement of crops. Estimates on cost of production, output and profitability in production of various crops helps individual farmers to decide on the crop combination they should adopt for increasing their farm income and decision on crop diversification. State on the other hand can use such estimates for deciding on providing incentives to the farmers in producing specific crops particularly in view of the fact that crop diversification through a change in the cropping pattern towards high value crops can ensure augmented farm income for the individual farmers as well as for the state. In the state of West Bengal where agriculture is the mainstay of the state economy and which has time and again proved to be the largest producer of rice in the country, one of the largest producers of jute and Mesta, potato and other vegetables, discussion on cost of cultivation, output and profitability in respect of various crops becomes an issue of paramount importance.

In this backdrop, effort has been made in the current paper to analyse the cost structure and profitability in respect of 7 major crops produced in West Bengal for a period from 2001-02 to 2018-19 with detailed discussion on the change in the cost structure and profit patterns over time and across various crops produced in the state. Effort has also been made to see the major factors affecting the profitability of these 7 major crops in the period as mentioned above.

In section II of the paper, major definitions used and methodology adopted for deriving various results to study the impact of different factors on profitability of the major crops of West Bengal has been discussed in brief. Section III discusses the cost structure observed in producing major crops in West Bengal for the period from 2001-02 to 2018-19 in detail. In section IV, broad trends in profitability of major crops in West Bengal in the referred period has been discussed. A brief discussion on the impact of different factors on the profitability of the major crops of West Bengal has been made in section V. Finally section VI concludes the



paper with notes on way ahead and policy prescriptions.

## II. Methodology

In this paper, We have used secondary data on cost of cultivation of major crops produced in West Bengal as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India for the period from 2001-02 to 2018-19 to analyse the cost structure and profitability of the major crops in West Bengal in the referred period and how the same has changed over time for different crops.

For the current paper, we have used the concept of paid out cost (out of pocket expenses) and catch-all cost in explaining results related to profitability of various crops. I have borrowed the calculation methodology of paid out cost from the manual by the 'Foundation for Agrarian Studies, Calculation of Household Incomes: A Note on Methodology (FAS 2015)' where imputed rental value of owned land, imputed value of family labour and interest on fixed capital (excluding land) were deducted from the total cost to arrive at the paid out cost for each crop. I computed paid-out cost of production in respect of all the major crops by following this methodology. Catch-all cost on the other hand was obtained from summing all cost components in the secondary database as above. Gross value of output (GVO) in respect of the crops was calculated by summing the value of main product and that of the by-product. Profitability of each crop was estimated considering both the cost definitions where GVO over paid out costs gives farm business income and GVO over catch-all cost gives net farm income.

In this paper, while studying the impact of various cost components, area under the crops and real output on profitability of 7 major crops of West Bengal for the period 2001-02-2018-19, we have applied panel regression for all crops taken together.

1) The basic panel equations are as follows:

The Fixed effect model:

$$Y_{it} = \beta_{1i} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + u_{it} \quad (1)$$

t = 1, 2, ... 17 (2001-2018)

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Potato, Paddy, Wheat, Mustard, Sesame, Jute)

*Dependent variable: Y = Profit (Paid out profit; **popprofit** & catch all profit; **capprofit**)*

*Independent variables: X = area, real output, seed cost, fertilizer cost, pesticide cost, irrigation cost, family labour cost, hired labour cost, animal labour cost, machine labour cost, imputed rent cost, interest on fixed capital.*

The Random effect model:

Here  $\beta_{1i}$  is not fixed, it is a random variable with mean value of  $\beta_1$ .

OPEN EYES

$$\beta_{1i} = \beta_1 + \varepsilon_i \quad (2)$$

$\varepsilon_i$  is the random error term with a mean value of zero and variance  $\sigma_\varepsilon^2$ .

Putting the value of (2) into (1), we get

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \varepsilon_i + u_{it} \\ &= \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + w_{it} \end{aligned} \quad (3)$$

Where,  $w_{it} = \varepsilon_i + u_{it}$

The composite error term  $w_{it}$  consists of two components, which is the cross section and, which is the combined time series and cross section error components.

We applied panel regression to find out the overall impact of various cost components, area under the crops and real output on profitability levels over the period 2001-02-2018-19. We have checked the results for both Fixed and Random models and thereafter used Hausman hypothesis test to find out which model is more efficient and consistent. We have used STATA 14.2 and GRETTL to run the regression result.

### **III. Cost of cultivation of major crops of West Bengal for the period from 2001-02 to 2018-19: A descriptive analysis**

For an analysis on cost of production of major crops produced in West Bengal for the period from 2001-02 to 2018-19, I have considered 7 major crops of West Bengal namely Paddy, Wheat, Mustard, Masur (Lentil), Til (Sesame), Potato and Jute and analysed the trend in the component wise cost of producing the crops in the state in the referred period dividing the period into two phases, Phase I- 2001-02-2010-11 and Phase II-2011-12-2018-19. As cost component wise analysis for the crops for all different years in the referred period will be unnecessarily elaborate, I have attempted to derive component wise average cost of production in two different phases both at current prices and at real prices and tried to understand the trend in the cost components in the two periods. For getting the real values of the cost components, I have deflated the nominal values of the costs for different years with consumer price index for agricultural labourers (with base 1986-87=100). For different crops, data for the available years in a phase has been used for estimating the average. For crops like paddy, Mustard, jute and potato, data on cost of production for all the years in phase-I(2001-02 to 2010-11) were available, whereas cost of production data were not available for all the years in phase-I(2001-02 to 2010-11) and could not be used for estimating averages for crops like wheat, Lentil and sesame. In phase-II however, data on cost of production for all the years in phase-II (2011-12 to 2018-19) were available for all the crops considered here and averages were estimated accordingly.

In the following tables 1A and 1B, component wise average cost of production in two different phases has been presented respectively at current prices and at real prices. From the following 2 tables, we can see that amongst the 7 crops considered, cultivation of potato

proved to be most expensive in both the phases and both in nominal as well as in real terms followed by jute. Total cost of cultivation (catch-all cost) of potato at current prices was found to be Rs 70779 per ha in phase-I and it more than doubled to Rs 142517 per ha in phase-II. These values were worked out to be Rs 18407 per ha and Rs 19663 per ha respectively in phase-I and Phase-II while computed in real terms and the increase in the total cost of cultivation was only around 7%. Even when we compare the component wise cost of various crops (at current prices), we see that almost all the cost components like cost of seed, fertilizer, irrigation etc had the highest values for potato cultivation except human labour (where jute surpassed potato) and animal labour (where both wheat and paddy surpassed potato) in the category of operational cost and interest on fixed capital and other fixed expenses within fixed costs in Phase-I whereas all cost components had the highest values for potato cultivation except hired human labour and a few fixed expenses in phase-II. Exactly the same trend was observed in case of potato cultivation when we compare the cost component values at real prices.

Whereas cost of cultivation of Til was found to be the lowest among the crops in Phase-I in both nominal as well as in real terms, in Phase-II lowest cost was found in case of Masur crop in both the measures. In Til cultivation during phase-I, the cultivators could save on the cost of fertilizer, animal labour, machine labour and other operational expenses and also under fixed costs, they could save on imputed rent for owned land (signifying comparatively less cultivation in owned land) and interest on fixed capital. In phase-II however, in all the components of operational expenses except machine labour and seed cost, masur crop was found to have a cost advantage thus making masur the most economical crop in the 2<sup>nd</sup> decade of the 21<sup>st</sup> century. Almost the same trend was observed for Til and Masur when the component costs were compared in real terms.

In both current prices and in real terms, cost of animal labour for cultivating the crops has decreased significantly between the two phases for all the crops considered (except Til and Potato in nominal prices) with a considerable increase in the component of machine labour. With the mechanisation of agriculture getting popularised for cultivation of almost all the crops and a steady growth in mechanisation in the last decade as compared to the initial years of the new century, this trend was quite expected in the state. As can be seen from table 1C below, there has been more than 100% increase in the machine labour cost (in real values) in case of all the different crops except potato whereas in nominal terms the growth % in the cost component was more than even 300% for most of the crops (except paddy, potato and Til where the growth % were respectively 121%, 145% and 243%)

Whereas cost of seed and fertilizer at current prices has increased between the two periods for all the 7 crops, in real terms, though cost of fertilizer increased for all the crops between the 2 periods, cost of seed increased for 5 major crops of Bengal (except jute and potato). Cost of irrigation in real terms has decreased over the 2 phases for all the crops except Jute implying a betterment in the irrigation infrastructure in the State and also possibly due to a

## OPEN EYES

better managed electricity distribution by the government for agriculture at affordable price in phase-II. As for jute, since the cultivation of the crop is concentrated mostly in the north Bengal districts and a few areas in the south Bengal, there might be typical irrigation infrastructure issues in those areas.

Interesting observations come in from table 1C where we can see that paid out cost has grown at a lower rate than the total cost (both in nominal and real terms) only in case of potato and in contrast to all other 6 crops where out of pocket expenses has grown at a much higher rate than the catch all cost over the two decades. It could be easily explained from table 1C that cost components like imputed value for family labour, imputed rental value for owned land (which are deducted from the total cost along with interest on fixed capital to arrive at the estimate of paid out expenses) have grown at a much higher rate as compared to the actual expenses for hired labour and actual rent paid for leased-in land for potato cultivation. This hints at the fact that where in case of all the other 6 crops, involvement of family labour in cultivation has substantially declined in the 2<sup>nd</sup> decade, potato cultivation has banked more on family labour with a noticeable growth in the imputed value of family labour in cultivation in the 2<sup>nd</sup> phase as compared to that in the 1<sup>st</sup> phase. Cultivation of potato in owned land has also increased at a faster rate than that in the leased in land over the two phases. In case of mustard and paddy cultivation, out of pocket expenses has grown at almost similar rates with the total expenses over the phases at both current price and real values. In case of both the crops, cultivation in leased-in land decreased substantially in the 2<sup>nd</sup> phase (against a rise in cultivation in owned land) resulting in a comparatively lower growth in paid out cost for the referred crops.

Now question arises as to whether these changes in the components of cost of cultivation of various major crops in the state and its dynamics over the period of two decades are reflections of farmers' choice in selection of crops produced by them considering the requirements of various inputs in the cultivation of the specific crops. Whether change in the cost of agricultural inputs over time impacts farmers' selection of crops for cultivation or it's the other way round is a complex issue and beyond the scope of discussions in this paper but one thing is undoubtedly true that dynamics of change in the components of cost of cultivation of various major crops has a direct bearing on how much income reaches to the farmers at the end and how far the farmers manage to sustain the cultivation of crops which they are traditionally used to cultivate.

Cost Structure and Profitability of Major Crops Produced in West Bengal

Table 1A : Component wise average cost of Cultivation (at current prices) of major crops produced in West Bengal for the period from 2001-02 to 2010-11 (Phase-I) and 2011-12 to 2018-19 (Phase-II)

Cost Component	Average cost of Cultivation of major crops in Phase-I (in Rs)										Average cost of Cultivation of major crops in Phase-II (in Rs)											
	Paddy	Wheat	Mustard	Masur	Til	Polato	Jute	Paddy	Wheat	Mustard	Masur	Til	Polato	Jute	Paddy	Wheat	Mustard	Masur	Til	Polato	Jute	
A : Operational Cost	20448.89	20484.83	13436.43	12691.33	12112.33	52155.43	21045.93	49215.98	35786.72	29660.30	23033.14	28517.53	106054.25	54474.79								
i) Seed	801.32	2106.29	267.29	1961.22	340.67	17764.91	542.78	1853.12	3650.12	562.08	2992.40	565.76	26817.11	872.24								
ii) Fertilizer & Manures	2331.17	2716.00	1873.38	1020.31	832.52	10795.42	1742.46	5589.42	5820.10	4592.33	1773.79	2906.40	23042.18	4097.36								
iii) Pesticides and Insecticides	302.80	170.08	193.69	26.38	142.87	1213.02	228.02	1095.56	95.77	332.98	40.59	285.53	3266.91	417.23								
iv) Irrigation charges	1315.56	2612.36	1636.91	199.71	872.34	2925.84	824.34	2227.40	3262.62	2112.00	57.88	1388.44	4617.72	2290.28								
v) Family Labour (Human)	6238.56	4708.07	3969.06	3505.58	4230.81	6545.26	6631.64	16233.87	7128.63	8881.38	6351.38	8469.59	18213.19	15515.22								
vi) Hired Labour (Human)	5727.56	4130.80	2739.67	2877.09	3360.42	7614.89	8045.93	15647.22	9026.12	8340.13	6279.47	9718.23	19781.90	25963.18								
vii) Animal Labour (Owned+hired)	2340.52	2554.38	1860.19	1952.33	1333.92	1780.20	1987.13	1908.30	1889.59	1524.52	1312.51	1401.27	2091.47	1638.55								
Machine Labour	933.91	1007.20	603.04	870.36	759.76	2068.81	589.49	3583.34	4043.83	2662.56	3716.48	2606.91	5075.45	2497.01								
viii) Other Expenses	457.48	479.67	293.22	278.36	239.03	1447.10	454.14	1077.75	869.95	652.32	508.64	1175.40	3148.33	1183.72								
B: Fixed Costs	8372.60	7401.12	6196.48	8055.29	5538.20	18623.66	9712.18	16606.29	11249.61	12520.74	12676.83	9909.15	36462.55	21560.61								
ix) Imputed rent for owned land	6433.19	5994.91	5095.38	7042.05	4713.58	15567.36	8433.08	13655.17	9480.20	10795.70	11336.03	8495.30	32449.29	18995.25								
x) Rent for leased-in land	432.64	53.43	120.37	0.00	47.43	2173.11	133.42	506.34	22.97	177.25	371.38	31.01	1964.89	327.89								
xi) Interest on fixed capital	1041.12	963.33	694.03	704.12	520.50	642.84	766.49	1633.14	1314.99	1106.99	554.56	924.07	1548.64	1629.96								
xii) Other Expenses.	465.66	389.45	286.70	309.11	256.70	240.35	379.20	811.63	431.45	440.80	414.85	458.78	499.74	607.52								
Total Cost (Catch-all cost) (A+B)	28821.49	27885.94	19632.91	20746.62	17650.54	70779.10	30758.11	65822.27	47036.33	42181.04	35709.98	38426.68	142516.80	76035.41								
Paid out Cost [(A+B)-(v+ix+xi)]	15108.63	16219.64	9874.44	9494.87	8185.65	48023.64	14926.90	34300.09	29112.51	21396.97	17468.00	20537.72	90305.69	39894.98								

Source: -Computed from the cost of cultivation/production and related data as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India in the period from 2001-02 to 2018-19. Other Expenses in Operational Cost includes payment for crop insurance, payment to contractor, interest on working capital etc. Other Expenses in Fixed Cost includes taxes and cesses, depreciation on implements and farm building etc.

OPEN EYES

**Table 1B: Component wise average cost of Cultivation (at real prices) of major crops produced in West Bengal for the period from 2001-02 to 2010-11 (Phase-I) and from 2011-12 to 2018-19 (Phase-II)**

Cost Component	Average cost of Cultivation of major crops in Phase-I (in Rs)							Average cost of Cultivation of major crops in Phase-II (in Rs)						
	Paddy	Wheat	Mustard	Masur	Til	Polato	Jute	Paddy	Wheat	Mustard	Masur	Til	Polato	Jute
A : Operational Cost	5295.36	4707.93	3460.89	2530.95	2675.30	13579.22	5432.48	6766.90	4954.51	4075.89	3165.19	3902.34	14624.20	7455.26
i) Seed	207.17	490.18	68.45	395.85	75.25	4572.50	138.32	255.07	500.03	77.01	410.44	78.89	3687.27	121.28
ii) Fertilizer & Manures	601.43	630.20	488.68	205.22	189.17	2839.12	448.81	768.35	810.20	635.30	263.92	399.04	3193.54	561.09
iii) Pesticides and Insecticides	77.43	40.48	47.95	5.18	32.74	311.89	60.83	148.45	14.74	45.48	5.66	38.51	449.30	57.12
iv) Irrigation charges	340.68	613.14	436.40	39.35	197.54	781.34	205.37	308.91	452.92	289.46	8.75	189.62	656.51	315.56
v) Family Labour (Human)	1608.01	1043.70	997.70	690.13	935.59	1701.79	1711.21	2219.60	982.41	1211.31	872.91	1144.27	2477.77	2136.60
vi) Hired Labour (Human)	1456.83	952.17	701.32	575.91	730.89	1978.48	2080.22	2159.51	1260.13	1149.79	862.77	1344.82	2732.65	3535.18
vii) Animal Labour (Owned+hired)	650.34	614.24	497.76	387.00	307.16	483.46	532.84	269.75	264.55	213.46	179.34	196.35	298.36	229.63
Machine Labour	234.53	212.49	146.25	176.55	154.20	533.86	137.49	489.04	548.94	364.33	501.45	355.81	695.64	337.18
viii) Other Expenses	118.94	111.32	76.40	55.78	52.75	376.79	117.39	148.22	120.60	89.75	69.94	155.02	433.17	161.62
B : Fixed Costs	2153.24	1724.49	1600.89	1623.92	1216.23	4827.97	2423.97	2286.59	1559.17	1728.17	1727.27	1356.40	5038.63	2950.88
ix) Imputed rent for owned land	1654.20	1382.21	1311.64	1420.38	1026.39	4143.74	2090.78	1875.67	1313.34	1492.34	1543.23	1164.99	4469.25	2598.35
x) Rent for leased-in land	95.02	11.06	25.11	0.00	9.75	448.37	32.81	71.01	3.02	23.39	48.29	3.90	282.88	42.19
xi) Interest on fixed capital	282.54	236.76	187.21	142.01	120.80	172.18	201.07	227.29	183.02	151.96	78.48	125.23	217.49	225.98
xii) Other Expenses	121.47	94.46	76.93	61.53	59.28	63.68	99.30	112.62	59.78	60.49	57.27	62.27	69.01	84.36
Total Cost (Catch-all cost) (A+B)	7448.60	6432.42	5061.78	4154.87	3891.52	18407.19	7856.44	9053.49	6513.69	5804.06	4892.46	5258.73	19662.83	10406.14
Paid out Cost [(A+B)-(v+ix+xi)]	3903.85	3769.75	2565.23	1902.36	1808.74	12389.48	3853.38	4730.93	4034.91	2948.45	2397.83	2824.23	12498.33	5445.21

**Source :** -Computed from the cost of cultivation/production and related data as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India in the period from 2001-02 to 2018-19. Real values have been calculated by deflating the values of the cost components at current prices by Consumer Price Index for Agricultural Labourers with base 1986-87=100.

Other Expenses in Operational Cost includes payment for crop insurance, payment to contractor, interest on working capital etc. Other Expenses in Fixed Cost includes taxes and cesses, depreciation on implements and farm building etc

**Table 1C: Component wise growth rates in average cost of Cultivation (at both nominal and real prices) of major crops produced in West Bengal between the two phases.**

Cost Component	Cost component wise growth rates in average cost of Cultivation between the two phases (in %)													
	Paddy		Wheat		Mustard		Masur		Til		Potato		Jute	
	Growth in Nominal values	Growth in Real values	Growth in Nominal values	Growth in Real values	Growth in Nominal values	Growth in Real values	Growth in Nominal values	Growth in Real values	Growth in Nominal values	Growth in Real values	Growth in Nominal values	Growth in Real values	Growth in Nominal values	Growth in Real values
A: Operational Cost	140.68	27.79	74.70	5.24	120.75	17.77	81.49	25.06	135.44	45.87	103.34	7.70	158.84	37.24
i) Seed	131.26	23.12	73.30	2.01	110.29	12.51	52.58	3.69	66.08	4.83	50.96	-19.36	60.70	-12.32
ii) Fertilizer & Manures	139.77	27.75	114.29	28.56	145.14	30.00	73.85	23.73	249.11	110.95	113.44	12.48	135.15	25.02
iii) Pesticides and Insecticides	261.81	91.72	-43.69	-63.60	71.92	-5.14	53.84	9.38	99.85	17.62	169.32	44.06	82.98	-6.10
iv) Irrigation charges	69.31	-9.32	24.89	-26.13	29.02	-33.67	-71.02	-77.77	59.16	-4.01	57.83	-15.98	177.83	53.65
v) Family Labour (Human)	160.22	38.03	51.41	-5.87	123.77	21.41	81.18	26.49	100.19	22.30	178.27	45.60	133.96	24.86
vi) Hired Labour (Human)	173.19	48.23	118.51	32.34	204.42	63.95	118.26	49.81	189.20	84.00	159.78	38.12	222.69	69.94
vii) Animal Labour (Owned+hired)	-18.47	-58.52	-26.03	-56.93	-18.05	-57.12	-32.77	-53.66	5.05	-36.08	17.49	-38.29	-17.54	-56.90
Machine Labour	283.69	108.52	301.49	158.33	341.52	149.12	327.01	184.03	243.12	130.75	145.33	30.30	323.59	145.25
viii) Other Expenses	135.58	24.62	81.37	8.34	122.47	17.48	82.73	25.37	391.73	193.86	117.56	14.96	160.65	37.68
B : Fixed Costs	98.34	6.19	52.00	-9.59	102.06	7.95	57.37	6.36	78.92	11.53	95.79	4.36	122.00	21.74
ix) Imputed rent for owned land	112.26	13.39	58.14	-4.98	111.87	13.78	60.98	8.65	80.23	13.50	108.44	7.86	125.25	24.28
x) Rent for leased-in land	17.03	-25.27	-57.01	-72.67	47.26	-6.86	*	*	-34.62	-60.02	-9.58	-36.91	145.76	28.57
xi) Interest on fixed capital	56.86	-19.56	36.50	-22.70	59.50	-18.83	-21.24	-44.73	77.53	3.67	140.91	26.32	112.65	12.39
xii) Other Expenses	74.30	-7.29	10.78	-36.71	53.75	-21.37	34.21	-6.94	78.72	5.04	107.92	8.37	60.21	-15.04
Total Cost (Catch-all cost) (A+B)	128.38	21.55	68.67	1.26	114.85	14.66	72.12	17.75	117.71	35.13	101.35	6.82	147.20	32.45
Paid out Cost [(A+B)-(v+i+x+xi)]	127.02	21.19	79.49	7.03	116.69	14.94	83.97	26.05	150.90	56.14	88.04	0.88	167.27	41.31

Source: -Computed from the cost of cultivation/production and related data as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India in the period from 2001-02 to 2018-19. Real values have been calculated by deflating the values of the cost components at current prices by Consumer Price Index for Agricultural Labourers with base 1986-87=100. Other Expenses in Operational Cost includes payment for crop insurance, payment to contractor, interest on working capital etc. Other Expenses in Fixed Cost includes taxes and cesses, depreciation on implements and farm building etc. \*Values in the concerned component was zero in phase-I for Masur crop.

We can here examine the major component wise average % share of cost in total cost of Cultivation of principal crops produced in the state for the two referred phases and can see how the shares have changed over time and whether that could have been the impact of farmers' choice of crops in the two periods or otherwise.

**Table1D: Principal Component wise average % share of cost in total cost of Cultivation of major crops produced in West Bengal for the period from 2001-02 to 2018-19**

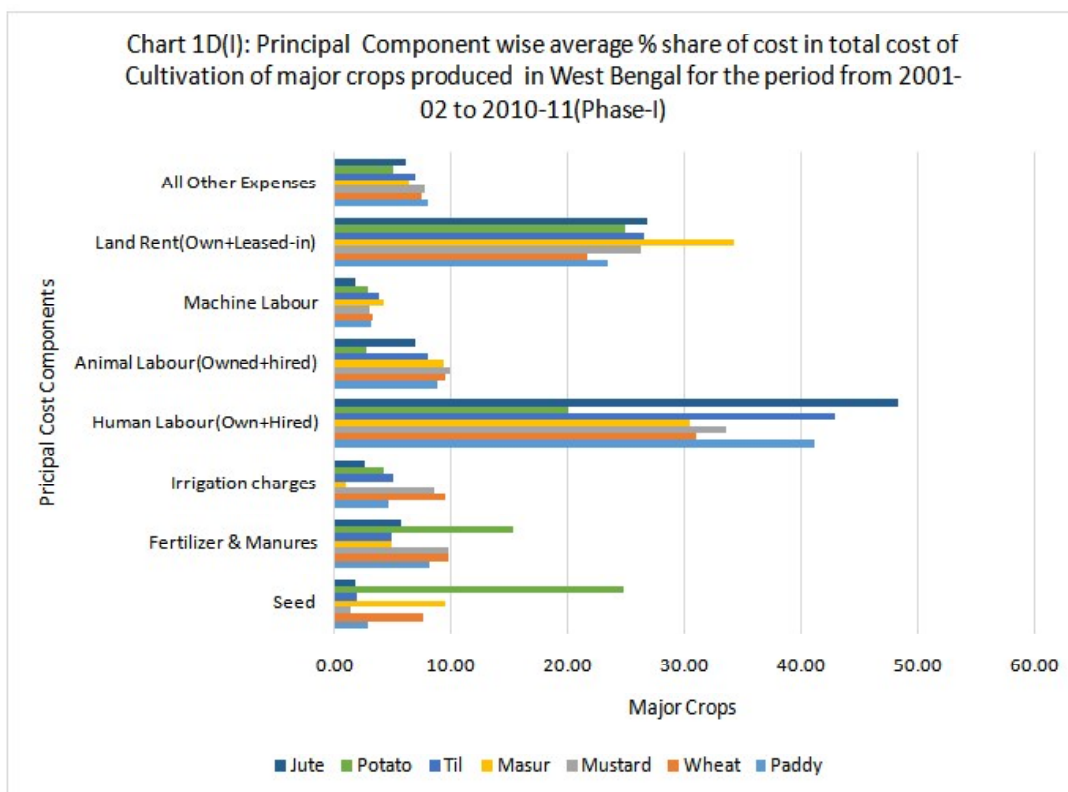
Cost Component	Phase-I (2001-02 to 2010-11)						Phase-II (2011-12 to 2018-19)							
	Paddy	Wheat	Mustard	Masur	Til	Potato	Jute	Paddy	Wheat	Mustard	Masur	Til	Potato	Jute
Seed	2.78	7.64	1.35	9.54	1.94	24.85	1.75	2.82	7.71	1.32	8.35	1.55	18.79	1.18
Fertilizer & Manures	8.08	9.79	9.69	4.94	4.87	15.32	5.74	8.49	12.47	10.97	5.38	7.73	16.31	5.43
Irrigation charges	4.56	9.54	8.59	0.94	5.06	4.26	2.60	3.40	6.95	4.98	0.20	3.52	3.37	3.10
Human Labour (Own+Hired)	41.13	31.03	33.58	30.44	42.91	20.10	48.37	48.34	34.29	40.60	35.96	47.29	26.59	54.29
Animal Labour (Owned+ hired)	8.75	9.55	9.86	9.30	8.01	2.67	6.93	3.04	4.01	3.71	3.63	3.92	1.53	2.31
Machine Labour	3.14	3.29	2.94	4.25	3.85	2.88	1.72	5.36	8.56	6.27	10.08	6.72	3.54	3.17
Land Rent (Own+Leased-in)	23.49	21.65	26.33	34.22	26.49	24.91	26.77	21.53	20.24	26.17	31.98	22.39	23.92	25.33
All Other Expenses	8.03	7.52	7.66	6.36	6.88	5.01	6.12	7.01	5.77	5.98	4.42	6.89	5.94	5.20
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Source: -Computed from the cost of cultivation/production and related data as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India in the period from 2001-02 to 2018-19. Other Expenses include cost of pesticides, other expenses under fixed cost and operational cost and interest on fixed capital

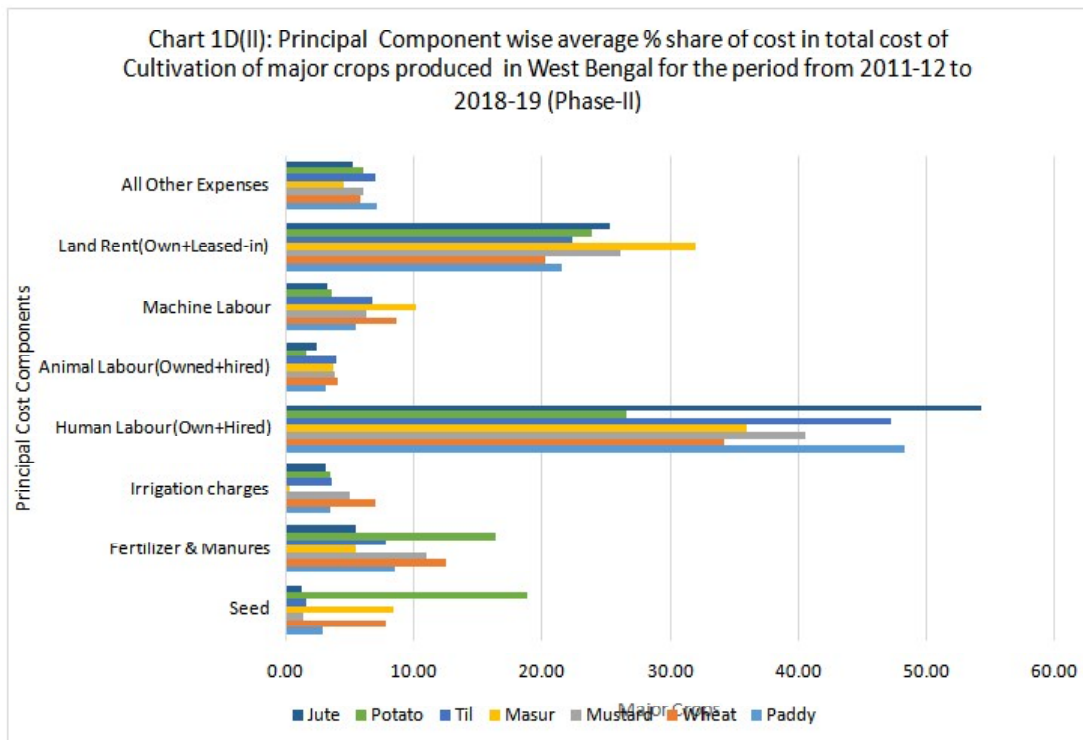


*Cost Structure and Profitability of Major Crops Produced in West Bengal*

As we can see from the above table and also from the charts below that potato cultivation has required one fourth of its cost of cultivation in seeds in the first phase which has declined to slightly less than one fifth in the 2<sup>nd</sup> phase and seed cost share of potato is not only highest amongst all the major crops followed by Masur and wheat crop in both the phases but also its manifold higher as compared to the other crops. Therefore, it requires no special intuition to predict that farmers' profitability from potato cultivation can be enhanced with a cut in the seed cost of potato through Govt. intervention or otherwise. (In the 2<sup>nd</sup> phase, it has already reduced by over 6% though which is a healthy sign). Other major cost components for potato cultivation were seen to be Land rent (both paid out and imputed) and Human labour cost (both paid out and family labour) in both the phases though human labour cost share has increased substantially in the 2<sup>nd</sup> phase (from 20.1% to 26.59%) as compared to the 1<sup>st</sup> decade. Cost share of fertilizer was also found to be the highest for potato cultivation in both the phases followed by wheat and Mustard. Share of fertilizer cost in total cost of cultivation didn't grow substantially over the two phases in case of crops except for Wheat and Til (where there was a near 3% growth in the relevant cost share). Cost share of animal labour has decreased and share of machine labour increased in the 2<sup>nd</sup> decade for all the major crops understandably due to the growth of mechanisation in agriculture in the state.



## OPEN EYES



Jute Cultivation in Bengal was found to be highly labour intensive in both the decades with cost share of human labour being near 50% in first decade which jumped to 54% in the 2<sup>nd</sup> phase. After Jute, Human labour component in total cost was also significantly higher in case of Til and Paddy in both the phases. In case of Jute and Til (Sesame) cultivation, scopes of mechanisation is limited at the stages of harvesting and threshing etc. and can't replace human labour and that might have been reflected in such high shares of human labour in total cost of cultivation.

### **IV: Value generated from the major crops of West Bengal and their profitability for the period from 2001-02 to 2018-19.**

Now, I would like to see the output generated from cultivation of various crops in West Bengal and profits earned over catch-all cost and paid out cost in both the phases. As year-to-year analysis of the above parameters (output and profit) for all the crops in the two phases will eat up much of our time and space, I would like to explain the above in terms of averages (average output, average cost and average net profit of all the reference years in a phase) for all the crops and for both the periods of study. This part of the discussion is going to be very interesting as net profits are final values which cultivators look for at the end of the crop seasons and whether they can sustain with the profits earned.

*Cost Structure and Profitability of Major Crops Produced in West Bengal*

**Table 2A: Profitability of various major crops of West Bengal (measured as average net profit rate over average Catch all costs) in the period from 2001-02 to 2018-19**

Name of the Crop	Phase-I			Phase-II		
	Average Output (in Rs/ha)	Average Cost (in Rs/ha)	Net Profit (in %)	Average Output (in Rs/ha)	Average Cost (in Rs/ha)	Net Profit (in %)
Paddy	27358	28821	-6.35	56868	65822	-13.56
Wheat	24211	27886	-13.32	37985	47036	-19.08
Mustard	20790	19632	5.01	43705	42181	4.26
Masur (Lentil)	28168	20747	36.87	46280	35710	26.64
Til (Sesame)	19946	17651	12.59	34058	38427	-10.51
Potato	67200	70779	-5.13	143015	142517	-0.67
Jute	34294	30758	7.12	78191	76035	2.25

Source: -Computed from the cost of cultivation/production and related data as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India in the period from 2001-02 to 2018-19.

Most disturbing picture comes in from table 2A above that average net profit rate over catch-all cost was found to be negative for 3 crops (Paddy, wheat and potato) in phase-I and one more crop was added in the list in the 2<sup>nd</sup> phase in the form of Til (Sesame). Net profit rates of paddy over catch-all cost was found to be negative in all the 10 years in phase-I except 2007-08 and 2009-10 (where the crop registered a net profit rates of 2% and 8% respectively) and that resulted in an average negative net profit rate in the 1<sup>st</sup> decade. For wheat however, net profit rate over catch-all cost was found to be negative for all the 6 years from 2005-06 to 2010-11 for which data were available. In case of potato, there was positive profits in 3 years (2003-04, 2005-06, 2010-11) in phase-I but that could not offset the loss in the remaining years. There were almost similar stories for year wise net profits of the referred crops in phase-II with the only change that net profits were negative for all the available years for paddy and wheat and that net profit rate was negative for Til crop in almost all the years in phase-II except in 2013-14 to 2014-15. But crops like Masur (36.87% and 26.64%), Mustard (5.01% and 4.26%) and Jute (7.12 % and 2.25%) registered positive net profits over catch-all cost in both the periods though the % of net profits declined in phase-II. Only in case of Til crop, though there was a sizeable positive net profit over catch-all cost of 12.59% in phase-I, it registered a net loss of 10.51% in phase-II.

## OPEN EYES

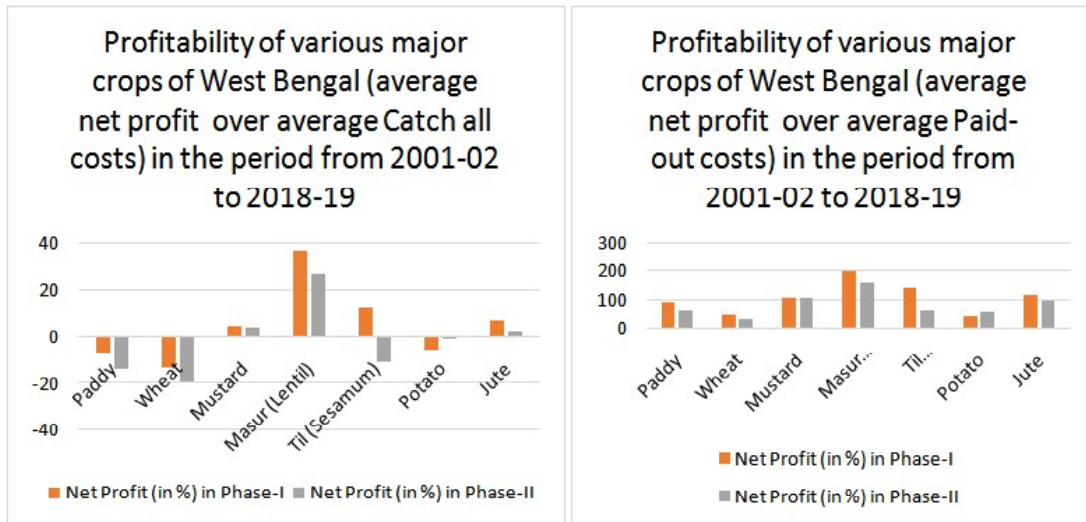
Table 2B: Profitability of various major crops of West Bengal (measured as average net profit rate over average Paid-out costs) in the period from 2001-02 to 2018-19

Name of the Crop	Phase-I			Phase-II		
	Average Output (in Rs/ha)	Average Cost (in Rs/ha)	Net Profit (in %)	Average Output (in Rs/ha)	Average Cost (in Rs/ha)	Net Profit (in %)
Paddy	27358	14109	93.22	56868	34300	65.72
Wheat	24211	16220	48.23	37985	29113	32.15
Mustard	20790	9875	109.86	43705	21397	106
Masur (Lentil)	28168	9495	200.39	46280	17468	160.94
Til (Sesame)	19946	8186	142.67	34058	20538	66.11
Potato	67200	48024	44.57	143015	90306	60.76
Jute	34294	14927	119.94	78191	39895	96.34

Source: -Computed from the cost of cultivation/production and related data as published by the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India in the period from 2001-02 to 2018-19.

Table 2B however gives little relief when we see that all crops in the two phases had registered positive net profits rate over paid-out cost. Masur (Lentil) crop turned out to be the most profitable crop in both the phases in terms of net profit rate (while measured in either of the two measures). Wheat on the other hand was proved to be the crop with lowest net profit in both the phases in terms of net profit rate measured in either of the two measures except in phase-I where net profit rate over paid-out cost for potato was found to be the lowest followed by wheat. Mustard, Masur, Jute and Til had a more than 100% net profit over paid-out cost in phase-I which could be maintained by only Mustard and Masur in phase-II. Net profit over paid-out cost was found to be in double digit figures in both the phases for all other crops.

**Chart-2**



The above discussion leads us to two important observations, i) Oilseeds and Jute crops garnered more profit as compared to that in case of cereals in both the phases and also in terms of both the profit measures (over Catch-all and paid-out cost) and ii) There has been a decline in the profit rates in cultivation of most of the crops in phase-II as compared to that in phase-I.

As for the first observation, In spite of the profit rates being lower for cereals as compared to that in case of oilseeds or jute, the cultivators in West Bengal are sticking to paddy (the major cereal) cultivation, 55-60% of the gross cultivated area of West Bengal being devoted to the cultivation of paddy in the state (State Handbook of West Bengal, 2011-2015 and Economic Review, 2021-22). This might be due to the wrong perception of most of the cultivators regarding estimates of cost and profits. They can't see the catch-all cost and therefore, while calculating profit of the crops, they don't consider the cost of their family labour or imputed rent value for cultivation carried out in their own land. They get concerned only with the paid out costs while preparing their estimates. (*Pal, B, Space and Culture, India, 2019, 7:3*) and accordingly they can't visualize the loss incurred in cultivating the concerned crops.

Now, as regards the decline in profit levels of the crops considered in the paper in phase-II as compared to that in Phase-I, the above tables 1A and 1B clearly show that growth in the average output of the crops (except potato) has not been able to offset the growth in their cost of cultivation in phase-II. Excessive increase in the input cost in the major part of the 2<sup>nd</sup> decade has led to such reduction in profit levels of all the crops (except potato) in phase-II. The cure to this issue therefore lies in an efficient cost-cutting mechanism in cultivation of the crops through a wisely developed public policy.

The above discussion therefore transpires that crop cultivation was not at all sustainable for the major crops in either of the 2 phases except for Mustard and Jute (Also Til in phase-

OPEN EYES

I) when profitability is computed as output over catch-all cost and that implies that, had the cultivators not used their own land for cultivation or putting their family labour, they had to suffer losses in the cultivation of all the 4 crops as stated above. That makes cultivation of the referred crops un-remunerative for the cultivators which in turn demotivates them from cultivating these crops. When major part of the gross cropped area in the state is put to crops like paddy, the above result has a serious implication.

It therefore becomes pretty important to see as to which of the cost components or output of crop impacted the profitability of the crops in the entire period from 2001-02 to 2018-19. As we didn't see any major difference in respect of profitability of the crops over the two phases (particularly in regard to negative net profits of crops measured over the catch-all costs), we have studied the impact of the cost components and the output of crops on the profitability of the crops (both estimated over catch-all cost or paid-out cost) for the entire period of reference and didn't venture into the analysis over two phases separately. As the study on the impact of component wise input costs, area under the crops and real output on the profitability of each of the 7 major crops produced in the state could again be extremely elaborate, I have tried to study the impact of the cost factors, real output, area under the crops etc. on the profit levels by taking all major crops considered through a panel regression (in respect of both the profit measures) but as regression of profitability over catch-all cost on the inputs and output yielded unconvincing results, the same was therefore not considered for analysis.

**Panel Regression for All Crops for the period 2001-02-2018-19:**

**Table 3: Random Effect Model (Dependent Variable: popprofit)**

popprofit	Coefficient	Std. Error	p-value
Area	.0000817	.0000236	0.001
Output real	.9997524	.0174293	0.000
Seed cost	-1.285898	.065567	0.000
Ferti cost	-.8966946	.2062451	0.000
Pesticost	-1.189146	.767264	0.121
Irrig cost	-1.385216	.2930715	0.000
Hirelab cost	-.7525693	.0595668	0.000
Animlab cost	-.6246878	.3121137	0.045
Machlab cost	-1.200183	.4301386	0.005
_cons	-111.1367	199.1907	0.577

R-squared Within = 0.9789 Between = 0.9979 Overall = 0.9849	Prob > chi 2 = 0.0000
--	-----------------------

**Table 4: Fixed Effect Model (Dependent Variable: popprofit)**

popprofit	Coefficient	Std. Error	p-value	Remarks
Area	-.0007541	.0002659	0.006	
Output real	1.028277	.018325	0.000	***
Seed cost	-1.124185	.0807159	0.000	***
Ferti cost	-.5771796	.1915216	0.003	
Pesti cost	-.5455334	.6948559	0.435	
Irrig cost	-1.349873	.3141583	0.000	***
Hirelab cost	-1.000686	.0939314	0.000	***
Animlab cost	-.5704499	.3199484	0.079	
Machlab cost	-1.043507	.4416494	0.021	
_cons	623.359	460.567	0.180	

R-squared Within = 0.9844 Overall = 0.7095	Prob > chi 2 = 0.0000
--	-----------------------

Hausman Test Result : Prob > chi 2 = 0.0001 (Since it is less than 0.05, hence we will choose Fixed Effect Model)

By accepting the results detailed in table-4 where profit over paid-out costs earned from the cultivation of all the 7 major crops was regressed over the area under the concerned crops, their various cost components and real output, we see that effect of real output, cost of seed, irrigation and hired labour on the profit over paid-out costs were statistically significant at 99% level of confidence (p-value being less than .001 in all the 4 cases). Out of these 4 variables, as expected, real output was observed to have a positive impact on profit on a 1:1 ratio whereas cost of seed, irrigation and hired labour negatively impacted the profit in the referred period. Out of these 3 cost components, cost of irrigation was seen to have the highest negative impact on profit (co-efficient value being -1.35) followed by seed cost (co-efficient value -1.12) and cost of hired labour (co-efficient value -1). Implication of the above result is obvious that when cost of production, area under the crops, real output and profit level of all the 7 major crops of the state are considered, relationship between the variables indicates shrinkage in profit primarily due to high cost of irrigation followed by cost of seed and hired labour and output growth obviously ensures growth in the profit levels on a 1:1 basis.

**V : Conclusion and way ahead :** Discussion on the cost structure in production of the major crops of West Bengal in the two periods from 2001-02 to 2010-11 (phase-I) and 2011-12 to 2018-19(phase-II) revealed that cultivation of potato was most expensive in both the

## OPEN EYES

phases and both in nominal as well as in real terms followed by jute. cost of cultivation of Til on the other hand was found to be the lowest among the crops in Phase-I in both nominal as well as in real terms. In Phase-II, lowest cost was found in case of Masur crop in both the measures.

As expected, In both current prices and in real terms, out of the cost components, cost of animal labour for cultivating the crops has decreased significantly between the two phases for all the crops considered (except Til and Potato in nominal prices) with a considerable increase in the component of machine labour. This is grossly on the expected lines where there has been noticeable improvements in the agricultural mechanisation in the 2<sup>nd</sup> decade. Cost of irrigation in real terms has decreased over the 2 phases for all the crops except Jute indicating development in the irrigation infrastructure in the state in the 2<sup>nd</sup> decade of the new millennium.

Coming to the profitability of the major crops, we find that average net profit rate over catch-all cost was found to be negative for 3 crops (Paddy, wheat and potato) in both phase-I and phase-II and Til (Sesame) crop was also observed to register negative profit in the 2<sup>nd</sup> phase. But crops like Masur (36.87% and 26.64%), Mustard (5.01% and 4.26%) and Jute (7.12 % and 2.25%) registered positive net profits over catch-all cost in both the periods though the % of net profits declined in phase-II. So except the 3 aforementioned crops, in case of all the other major crops, the farmers couldn't earn enough to cover the cost of cultivation which is worrisome.

As regards the profit over paid-out cost however, all crops in the two phases had registered positive net profits. Masur (Lentil) crop turned out to be the most profitable crop in both the phases in terms of net profit rate (while measured in either of the two measures). Wheat on the other hand was proved to be the crop with lowest net profit in both the phases in terms of net profit rate measured in either of the two measures except in phase-I where net profit rate over paid-out cost for potato was found to be the lowest followed by wheat.

But the above dynamics of profitability of major crops produced in the state over the period of two decades could not be related to the farmers' choice in selection of crops produced by them considering the requirements of various inputs in the cultivation of the specific crops and/or the net profits earned thereby. In spite of negative net profits (over catch-all cost) generated from the cultivation of paddy, wheat and potato, farmers were observed to put major share of their land in the cultivation of these crops. This is largely because of their inability to judge the total cost involved in the cultivation of the respective crops and their inability to come out of the habits of cultivating traditional crops instead of trying for crop diversification.

Now, to enhance farmers' income from cultivation which can only be ensured by raising their profit from crop cultivation, farmers are needed to be made aware of the dynamics of cost and output produced from cultivation of various crops and the concepts of cost imputation involved in the form of family labour and/or land rent on owned land so that they can differentiate between the profit earned by them over the total cost and that over the paid-out cost only.



This knowledge can motivate them to shift to crops generating higher profits in actual terms after covering the total cost of cultivation and in the process they can ensure a sustainable income through a proper crop diversification on the available resources. At the same time, efforts are needed on the part of the government to control prices of agricultural inputs like fertilizer, irrigation etc. (accounting for the major cost share other than hired labour cost as seen in the panel regression results in table-3) so that input cost burden on the farmers can be lessened to some extent and in turn raises their profit and farm income. For increasing production of crops (which was seen to have a 1:1 relation with profit of all crops taken together), yield enhancing techniques of farming need to be adopted by the farmers like land preparation before transplantation through modern agricultural tools, testing of soil to have a check on the fertility levels, application of timely irrigation and use of proper and timely pest control measures.

### **Bibliography**

1. Deshpande, Tanvi (March, 2017), State of Agriculture in India, PRS Legislative Research ('PRS')
2. Government of India (2014), Agricultural Statistics at a Glance, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Directorate of Economics and Statistics, New Delhi
3. Government of India (2016), Agricultural Statistics at a Glance, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Directorate of Economics and Statistics, New Delhi
4. Government of India (2019), Agricultural Statistics at a Glance, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation, Directorate of Economics and Statistics, New Delhi
5. Government of India, Department of Agriculture and Co-operation, [www.agricoop.gov.in](http://www.agricoop.gov.in)
6. Mathur, Archana S, Surajit Das, Subhalakshmi Sircar (2006). Status of Agriculture in India, Trends and Prospects, *Economic and Political Weekly*, 41 (52) : 5327-5336.
7. Singh, I. J, K.N. Rai and J. C. Karwasra (1997). Regional Variations in Agricultural Performance in India, *Indian Journal of Agricultural Economics*, 52 (3) : 374-386.
8. Kannan, Elumalai (2015): "Trends in Agricultural Incomes : An Analysis at the Select Crop and State Level in India," *Journal of Agrarian Change*, Vol 15, No 2, pp 201-19
9. (2013): "Profitability in Crops Cultivation in India: Some Evidence from Cost of Cultivation Survey Data," *Indian Journal of Agricultural Economics*, Vol 68, No 1, pp 104 - 21.
10. State finance of West Bengal, December, 2017, [www.wbfin.gov.in](http://www.wbfin.gov.in)
11. 'Foundation for Agrarian Studies, Calculation of Household Incomes : A Note on Methodology (FAS 2015)'

OPEN EYES

12. *Cost of cultivation/production and related data*, Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India.
13. Pal, B (2019). *'The profitability of Paddy cultivation and Farmers' perception in West Bengal with special reference to Purba Bardhaman district' Space and Culture, India, 2019, 7:3*
14. Government of West Bengal (2011), State Handbook of West Bengal, Bureau of Applied Economics and Statistics, Kolkata
15. Government of West Bengal (2012), State Handbook of West Bengal, Bureau of Applied Economics and Statistics, Kolkata
16. Government of West Bengal (2013), State Handbook of West Bengal, Bureau of Applied Economics and Statistics, Kolkata
17. Government of West Bengal (2014), State Handbook of West Bengal, Bureau of Applied Economics and Statistics, Kolkata
18. Government of West Bengal (2015), State Handbook of West Bengal, Bureau of Applied Economics and Statistics, Kolkata
19. Government of West Bengal (2021-22), Economic Review, Bureau of Applied Economics and Statistics, Kolkata
20. BIRTHAL, Pratap S, DIGVIJAY S NEGI and DEVESH ROY (2017): 'Enhancing Farmers' Income: Who to Target and How?' Policy Paper 30, ICAR—National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP), New Delhi.
21. Reddy, A (2015), 'Regional disparities in profitability of Rice Production: Where small farmers stand?' Vol. 70. No.3, July-Sept, 2015, Indian journal of Agricultural Economics.

---

*Hemanta Sarkar*  
*Deputy Director, Bureau of Applied Economics and Statistics,*  
*Dept. of Planning and Statistics, Govt of West Bengal*

**Beyond Cartography: The Unmappable in Anthony Minghella's  
Cinematic Representation of Michael Ondaatje's *The English Patient*  
Dr. Chinnadevi Singadi & Malvika Lobo**

**Abstract**

This essay attempts to ascertain the challenges of cartography or mapping of people and the places they encounter as envisioned by film director Anthony Minghella in his consummate Academy award winning movie *The English Patient*, a cinematic adaptation of Canadian author Michael Ondaatje's Booker winning novel of the same name published in the year 1992. By resting its focus on the cartographic elements of the movie, this study will try to highlight the postmodern landscape of the English patient's perishing body, his talk, his identity, his only possession his weathered and constantly transforming copy of *Histories*, all coloured by the elements of the various landscapes through which he travels – the caves, deserts and war-torn villas he journeys into – even as they constantly evade any and all attempts of plausible mapping.

Keywords : The English Patient, Franco Moretti, Cartography, Postmodernism

Franco Moretti, in his project 'The Atlas of European History 1800- 1900', suggests that literature can contribute immensely to geography's understanding of spaces. He creates a culmination of literary maps using novels to reveal more intricate details of lived spaces and the experiences associated with them. The first section of his book talks of the geography contained in the text and those that the narrative constructs. In this cartographic exercise, Moretti creates maps primarily based on the reading and understanding of the plot in novels. Schilling claims that Moretti's project does not disclose that locales navigated by a character "do not have the same status as those places mentioned in passing by the narrator or that, now destroyed or reconfigured, exist only in and through the memories characters have of them" (221). He also says that the actual and virtual space "cannot be put on the same plane" (Ibid).

Projects such as ETH- Zurich address key factors concealed in Moretti's project, for instance, the fact that locales such as the routes travelled by characters do not share the same status as some other places mentioned in the narrative or may also have been destroyed to exist solely in character's memories (Schilling 222). In the same vein, this paper mainly concerns itself with how geography operates within the text in *The English Patient*. In Moretti's project,

---

Singadi, Dr. Chinnadevi & Lobo, Malvika : Beyond Cartography: The Unmappable in Anthony Minghella's Cinematic Representation of Michael Ondaatje's *The English Patient*  
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 18, No. 1, June 2021, Page : 85-90, ISSN 2249-4332

## OPEN EYES

the maps are created based on novels to explore how geography “shapes the narrative structure of the European novel” (5). In this view, Pamela Gilbert says that maps help people see where they fit into and that “perform an important function in defining communities—not only spatial communities but interpretive and identity-based communities” (11) (Cook 61). Novels, according to Moretti, function “as the symbolic form of the nation-state, an essential component of our modern culture” (6). And thus, both novels and maps can create political realities (Cook 61).

Likewise, one can talk about another concept of unmapping as the resistance to mapping identity. In an essay written in the influential volume *Literature and Cartography: Theories Histories Debates*, Robert Stockhammer, in an essay titled ‘The (Un)Mappability of Literature’ states that these projects do not define a map (72). For example, Franco Moretti uses figures that most people consider to be maps based on popular belief. Stockhammer claims that geographers do not take this definition of a what map is for granted (73). The mapping of literary texts is a representation of various narratives that might not be an adequate depiction of the real spaces, scientifically speaking. However, mapping literary texts can uncover and unveil experiences of human beings in places that are not being acknowledged. Taking literary mapping as the point of departure, the claim is that the landscapes and the identity of the protagonist Almásy in the movie are continuously unmapped, thus resulting in its plurality. *The English Patient* is a novel whose characters display an aversion to cartographic impulses of mapping. The term unmapping is used in the metaphoric sense and talk of how identities in the film are constantly in flux and plural in nature.

Though it is possible to some extent to map the routes traversed by the narrative of *The English Patient*, it uncovers many anomalies. The protagonist Almásy is named after a real-life cave explorer of the same name who discovered the rock painting of the Cave of Swimmers in Egypt. The cartographic exercise of the novel reveals the fact that the Cave of Swimmers, explored by the cartographer Almásy in the novel, is a fictional representation of a real cave in the Sahara desert. The original explorer of the cave, László E. de Almásy’s book titled *The Unknown Sahara* contains a chapter that talks about this cave. In the Sahara desert, basins filled with water were principal refuges to humans (Svoboda 159) propose that the pictures on the cave are visual representations of people swimming and called them “Swimmers”, though recent studies have indicated that the figures were not swimming but 3 were engaged in a ritual (162). The explorer László E. de Almásy proposes a possible climate change that occurred that created the landscape shift causing the water body nearby to dry as the desert was forming. Water bodies in deserts are vital for human civilization. He indicates that at some point in time, there must have been a water body somewhere in the vicinity of the Cave of Swimmers that does not exist now as geographical features changed over time. Incidentally, it is also the place where Katharine dies of starvation and thirst. Thus, the geographical features around the Cave of Swimmers are unmapped over time owing to subject to temporal climate change.

Moreover, the protagonist, Almasy, is continuously engaged in the process of unmapping himself as his identity is always in flux. His burnt body is beyond recognition, and all his features are burnt, erasing all marks of identification. In the novel, *The English Patient* is described as "a man with no face. An ebony pool. All identification is consumed in a fire. Parts of his burned body and face had been sprayed with tannic acid, that hardened into a protective shell over his raw skin. . . . . There was no recognize in him" (Ondaatje 50). Younis observes that the film transforms the image of the patient himself. In the novel, the patient has no expression, that his nerves have been destroyed (Ondaatje 29), and that he has no face (Ondaatje 48) (Younis 3). However, in the film, the patient does show emotion, and his face is not expressionless. Furthermore, he also points out this is due to the requirement of melodramatic elements in the film, as an expressionless ambiguous protagonist barely makes a mark on the audience (Ibid). Almasy is unable to recognise himself and the people around him are unable to recognise him as well. The English patient's Hungarian origins remain masked to his nurse, and he is presumed to be English due to his accent.

The English Patient is cared for by Hana in an Italian villa. The walls of the villa have broken and "one bomb crater allowed moon and rain into the library downstairs – where there was in one corner a permanently soaked armchair" (Ondaatje 8). The villa is no longer a closed shelter which protects its inhabitants from harsh weather. Hana compares the books that she reads to the English patient and says that "they had gaps of plot like sections of a road washed out by storms, missing incidents as if locusts had consumed a section of tapestry" (7) and the villa is like the books. The villa was a war hospital, that is now long abandoned save for Hana and her patient along with Kip and Caravaggio who visit. The villa ceases to be a home but now has plural identity as a site for a multitude of activities.

Since maps are an integral part of the identity creation, it is used to classify and differentiate various nation-states. However, the English patient displays an aversion to his own national identity. The viewers of the movie observe that the national identity becomes paramount in the post-war scenario as Almasy is constantly asked for his national identity even in times of dire need. The end of the film sees Katharine's husband crash his plane towards Almasy, and Katharine in a combined suicidal and murder attempt. Almasy is forced to leave her in the Cave of Swimmers while he goes and looks for help to treat wounded Katharine. After days of walking, he meets English soldiers. When asked for Katharine's nationality Almasy says that it does not matter as she is dying. He also describes her as his wife, unwilling to accept that she was Geoffrey Clifton's wife. Katharine's British identity is unmapped, and Almasy's sunmapping of Katharine's identity is accompanied with some resistance from the outsider. The British are not sympathetic towards Almasy's outbreak and imprison him, which causes Katharine to die of starvation. In the face of death, Almasy refuses to acknowledge Katharine's national identity and personal relationships. While he carries Katharine's body out of the cave, he hears her voice over uttering, "that is all I have wanted, to walk in such a place with you, an earth with no maps. We are the real countries, not the boundaries drawn on maps

## OPEN EYES

by powerful men” (Minghella and Ondaatje). Besides, he is also mistaken to be a German spy as “he did not give them the right name” (Ondaatje 266) when he comes to El Taj to ask for help to save Katharine. To the English, he is “another possible second-rate spy. Just another international bastard” (268).

Almásy’s quest in the desert, apart from explorations, is also to eliminate traces of his former identity. Ironically, Almásy, despite being a cartographer and dealing extensively with mapping terrains and routes, finds himself engaging in the process of unmapping himself in the novel. He expresses his desire to “erase his name and the place he had come from” (148). He admires the Bedouin people he encountered, referred to as “the most beautiful humans I’ve met in my life” (147). With them, Almásy “became nationless” (Ibid). He asserts that Madox died because of nations, and he has “come to hate nations” and humans “are deformed by nation-states” (Ibid). The desert is further rendered nationless and beyond borders. The desert “could not be claimed or owned. . . It was a place of faith. We disappeared into the landscape” (148). Thus, the landscape of the desert is a transnational space that is beyond borders. On spending ample time in the desert, it became possible for Almásy “to slip across borders, not to belong to anyone, to any nation” (Ibid). Katharine and Almásy’s story blossomed primarily in the desert. The desert in the film is a place that resists identity, and despite being a cartographer, Almásy is unable to think of the desert in merely cartographic terms. In the film, the desert landscape is personified, personalised, and described as a woman’s body. While in conversation with Madox, he asks if a place at the hollow base of a woman’s throat has an official name. He renames the same spot on Katharine’s body and claims to be his own, calling it Bosphorus (250).

The geopolitics associated with the war mean very little to Almásy. He views maps as a means of exploration and data instead of objects harbouring classified information that need protection. Thus, he leaves confidential maps behind and conflicts with Madox, who wishes to guard the maps from the enemy. Just like how Katharine and Almásy’s love transcends notions of national and geographical identity along with societal fidelity, the landscape in which they fall in love exists bereft of any cartographic impulse of mapping. The desert exists by itself, defined by its own landscape of sand dunes and caves. The idea of love that Almásy and Katharine share transcends nationalities and hence is unmapped. Any national boundaries do not mar the desert. Katharine and Almásy constantly, reinforce national boundaries and land relations.

Along with the centrality of Almásy’s character in the film, his only possession- a copy of Herodotus’ *Histories*- in which he has added his own jottings, maps and entries occupies a major part of the narrative. The English patient is amnesiac, and he is unable to recollect who he is. It is through the book that Hana uncovers Almásy’s identity and experiences. The book is an object that is unmapped and no longer remains Herodotus’ *Histories*. By adding his accounts, Almásy carves his own narrative into Herodotus’ text. Herodotus’ *Histories* is constantly being rewritten by Almásy’s additions. As Friedman points out, “the *Histories* has

been made into his commonplace book, but one that lacks an owner's name. The book becomes the palimpsest on which he joins his voice to that of Herodotus" (56).

Douglas Stenberg explores the various dimensions of love in the film. He explains that the motif of water is prevalently used in the novel and the film. Almásy recalls how Geoffrey talks of Katharine's love for water in the novel, and Almasy is joyful as Hana takes him in the rain. Almásy recalls that Katharine was happier around water "she was always happier in the rain, in bathrooms steaming with liquid air, in sleepy wetness, climbing back infrom his windowthat rainy night in Cairo and putting on her clothes while still wet, in order to hold it all"(Ondaatje181). Elements of the desert and water consume the English patient's unmapped identity in the film. Almasy spent ten years in the desert getting consumed by the dry landscape and sand while Katharine spends hours swimming or in the bath, getting consumed by water. To Hana he is an "a pool for her"—"an ebony pool"(50). Almásyalso believes that "in the desert, you celebrate nothing but water"(26). His own love story with Katharine stems out of liquids as "their bodies had met inperfumes, in sweat, frantic to get under that thin film with a tongue or a tooth" (185). Rather than being categorised by nations, Almásyfinds himselfunmapped and consumed by the elements of the desert landscape and water.

In conclusion, Almásy's identity in the film is unmapped as it transcends national borders and merges with the various geographical elements of the desert. Studying the cartographic aspects of the novel revealed that there is resistance to national identity in the post war scenario. The search for identity in the novel drifts from the public domain and finds itself on a more fundamental level and is described by elements that make up landscapes. While geographical location and borders have been dominant identity markers, the postmodern transnational novel looks for identifications beyond borders. The objects and people in *The English Patient*find themselves fusing with geographical elements of landscapes instead.

#### Works Cited

- Cook, Susan. "Mapping Hardy and Brontë", *Literary Cartographies: Spatiality, Representation, and Narrative*, edited by Robert Tally Jr, Palgrave MacMillan, 2014, 61- 73.
- Friedman, Rachel D. "Deserts and Gardens: Herodotus and 'The English Patient.'" *Arion: A Journal of Humanities and the Classics*, vol. 15, no. 3, 2008, pp. 47–84.
- Gilbert, Pamela. *Mapping the Victorian Social Body*. SUNY Press, 2004.
- Minghella, Anthony, director. *The English Patient*. Miramax Home Entertainment, 1997.
- Minghella, Anthony, and Michael Ondaatje. *The English Patient: A Screenplay*. Methuen Drama, 1997.
- Moretti, Franco. *Atlas of the European Novel 1800-1900*. Verso, 1998.
- Ondaatje, Michael. *The English Patient*. Bloomsbury Publishing. Kindle Edition, 2018.
- Schilling, Derek. "On and Off the Map: Literary Narrative as Critique of Cartographic Reason." *Literary Cartographies: Spatiality, Representation and Narrative*, edited by Robert

OPEN EYES

- Tally Jr, Palgrave MacMillan, 2014, 215-28.
- Stenberg, Douglas G. "A Firmament in the Midst of the Waters: Dimensions of Love in 'The English Patient.'" *Literature/Film Quarterly*, vol. 26, no. 4, 1998, pp. 255–262.
- Stockhammer, Robert. "The (Un)mappability of Literature." *Literature and Cartographies: Theories, Histories, Genres*, edited by Anders Engberg-Pedersen, MIT Press, 2017. 65- 85.
- Svoboda, Jiří. "Action, Ritual, And Myth in The Rock Art of Egyptian Western Desert." *Anthropologie (1962-)*, vol. 47, no. 1/2, 2009, pp. 159–167.
- Younis, Raymond Aaron. "Nationhood and Decolonization in 'The English Patient.'" *Literature/Film Quarterly*, vol. 26, no. 1, 1998, pp. 2–9.

---

*Dr. Chinnadevi Singadi*  
*Assistant Professor, Department of Indian and World Literatures*  
*English and Foreign Languages University, Hyderabad*

*Ms. Malvika Manisha Lobo*  
*Research Scholar, Department of Indian and World Literatures*  
*English and Foreign Languages University, Hyderabad*



## Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes. It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
  1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
  2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Harper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

**Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.**

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

### Executive Editors

#### OPEN EYES

S.R.Lahiri Mahavidyalaya ,

Majdia , Nadia-741507, West Bengal, India,

Phone-03472-276206.

bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,

srlmahavidyalaya@rediffmail.com

Please visit us at : [www.srlm.org](http://www.srlm.org)

**OPEN EYES**

**Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas**

Volume 19, No. 1, June 2022

Published by :

S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.

Printed by :

Price : One hundred fifty only